আমাদের ছুটি – ৪০শ সংখ্যা

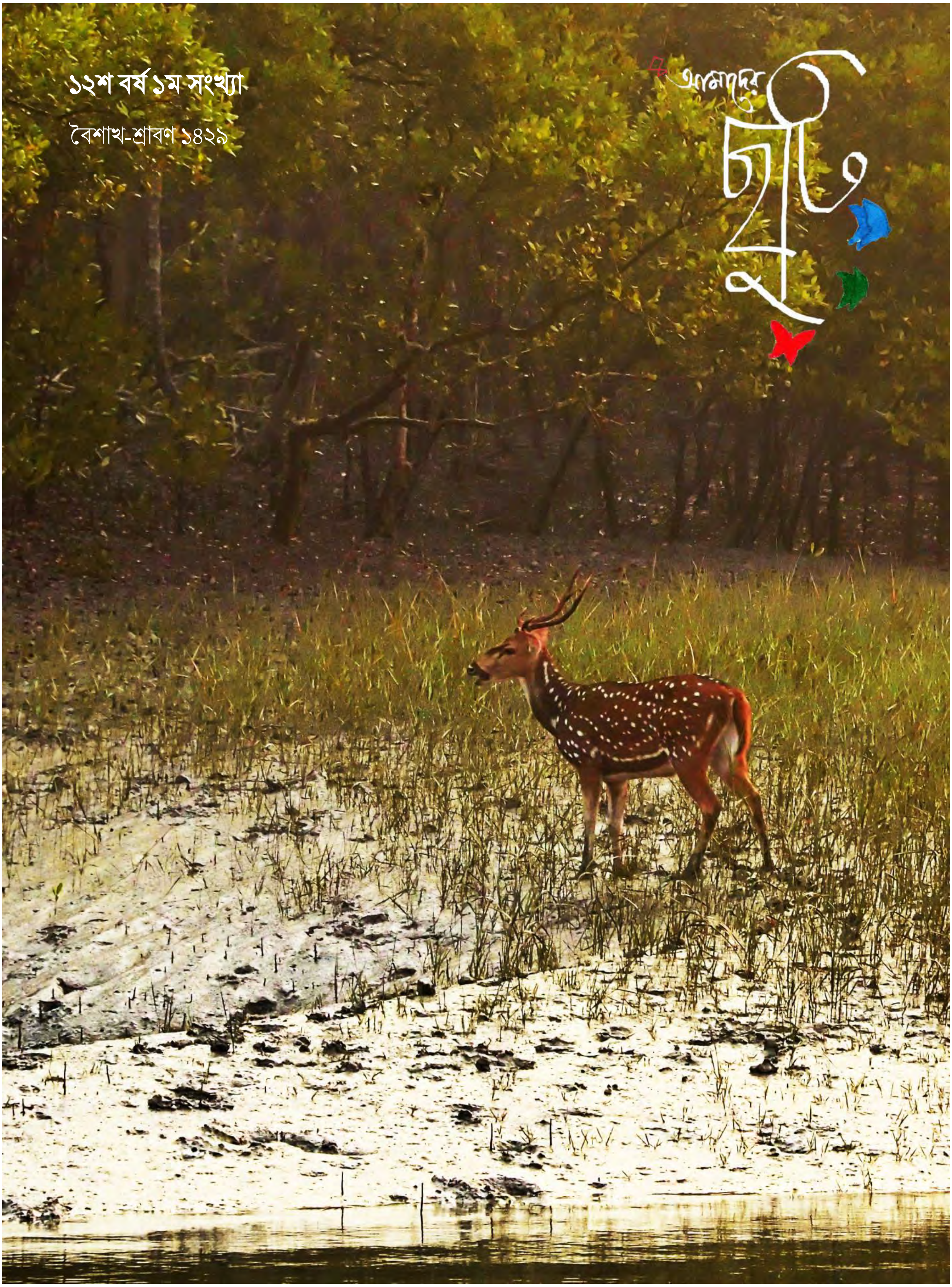

সূর্যোদয়ের আভায় - সুন্দরবনে - আলোকচিত্রী রত্নদীপ দাশগুপ্ত

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ - শ্রাবণ ১৪২৯

এবছর পাহাড়চূড়ায় ওঠায় জয়জয়কার বাঙালি মেয়েদের। মে মাসের ২২ তারিখে ইতিহাস গড়লেন বাঙালি পর্বতারোহী পিয়ালি বসাক। সাপ্লিমেন্টারি অক্সিজেন ছাড়াই এভারেস্ট জয় করেছেন তিনি। গত অক্টোবরে এদেশের প্রথম মহিলা পর্বতারোহী হিসাবে পৌঁছেছিলেন ধৌলাগিরি শৃঙ্গে। সেবারও শৃঙ্গজয় অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই। ধৌলাগিরি, এভারেস্ট ছাড়াও মানসালু এবং লোৎসের মতো আটহাজারি শৃঙ্গও আরোহণ করেছেন পিয়ালি। বিনা অক্সিজেনে এভারেস্ট জয়-এর পরের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন তিনি। ঘরে ফিরেই জানিয়েছেন, ''সব আট হাজারি শৃঙ্গ বিনা অক্সিজেনেই জিতব।"

অন্যদিকে এপার-ওপার দুই বাংলারই প্রথম বাঙালি হিসেবে গত ২২ জুলাই বিশ্বের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ কে-টু জয় করলেন ওয়াসফিয়া নাজরিন। কারাকোরাম পর্বতমালার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কে-টু। উচ্চতায় এভারেস্টের পর হলেও পর্বতারোহীদের কাছে সবচেয়ে কঠিন পর্বত হিসেবে কে-টু-এর পরিচিতি। ১৯৫৪ সাল থেকে মাত্র ৪২৫ জন এই পর্বতের চূড়ায় উঠেছেন, যাঁদের মধ্যে ২০ জন নারী এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের দেশের প্রথম নারী পর্বতারোহী হিসেবে কে-টু জয় করেছেন। এখনও পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশি এবং দ্বিতীয় বাংলাদেশি নারী হিসেবে ২০১২ সালের ২৬ মে এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন ওয়াসফিয়া। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহী হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গও জয় (সেভেন সামিট) করেছেন তিনি।

নারীদের শিখরছোঁয়া মুকুটে আরেক পালক যোগ করেছেন পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সাতারার বাসিন্দা বছর তিরিশ বয়সী প্রিয়ঙ্কা মোহাইত। এভারেস্ট, লোৎসে, মাকালু, অন্নপূর্ণাজয়ের পর প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে পাঁচটি আট হাজারি শৃঙ্গের শিখর ছুঁয়ে ফেললেন তিনি, গত ৫ মে বিকেল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় পৌঁছে।

গত দুবছর প্রায় সকলেই আতঙ্কে ছিলেন অতিমারী নিয়ে, যার একটা বড় প্রভাব পড়েছিল পর্যটন শিল্পে। তারপর সবে যখন আবার করে ঘরের বাইরে পা রাখা শুরু হয়েছে, করোনার চতুর্থ ঢেউ এসে পড়ল। তবে আশার কথা এই যে ভাইরাসের মারণশক্তি হ্রাস পেয়েছে, সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গেই তার মিল বাড়ছে ক্রমশ। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাঙালির চিরচেনা দি-পু-দা (দিঘা-পুরী-দার্জিলিং) সরগরম হয়ে উঠেছিল পর্যটকের ভিড়ে। এবছর শারদোৎসব তো বেশ তাড়াতাড়িই। ট্রেনের সংরক্ষিত টিকিটও হুড়মুড়িয়ে ফুরিয়ে গেছে আগাম বুকিং শুরু হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেই ঘুরে আসুন জলে-জঙ্গলে-পাহাড়ে যেদিকে মন চায়। 'আমাদের ছুটি' তে লেখা পাঠান ফিরে এসে, আমরা রইলাম তার অপেক্ষায়।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ এই সংখ্যায় ~

~ আরশিনগর ~

সান্দাকফু- ফালুট ট্রেক – পঙ্কজ দত্ত

সুন্দরবন ভ্রমণ এবং দুই বাঘের গল্প – দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ সব পেয়েছির দেশ ~

মায়াভরা পথে মদমহেশ্বর – পল্লব চক্রবর্তী

কদিনের কুর্গ – প্রজ্ঞা পারমিতা

বাঘের খোঁজে টাডোবায় – শুভেন্দু রায়

~ ভুবনডাঙা ~

ভিয়েতনাম- কাম্বোডিয়া – সাতান্ন বছর পরে আবার – তপন পাল

বাঘের বাসা থেকে ফিরে আসা – সুবীর কুমার রায়

~ শেষ পাতা ~

একদিনের জন্যই ভ্রমণ – সৌমাভ ঘোষ

বড়ন্তির সূর্যাস্ত – অরিন্দম পাত্র

For any queries/complaints, please contact amaderchhuti @gmail.com
© 2011 - 2022 AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

সান্দাকফু-ফালুট ট্রেক

পঙ্কজ দত্ত

~ সান্দাকফু ট্রেক রুটম্যাপ || সান্দাকফু ট্রেকের আরও ছবি ~

১৬ এপ্রিল ২০২১-এ আমরা সাতজনের একটা দল কলকাতা থেকে রওনা দিলাম সান্দাকফু-ফালুট-এর উদ্দেশে। সান্দাকফু পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে উঁচু শৃঙ্গ এবং ফালুট দ্বিতীয়। রাতের খাবার খেয়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। গল্প-আড্ডা হতে হতে কখন চোখ দুটো বুজে গেল বুঝতেই পারলাম না।

নিউ জলপাইগুড়ি নেমে ফোন করলাম আমাদের গাড়ির দাদাকে যিনি মানেভঞ্জন অবধি নিয়ে যাবেন। পৌঁছতে প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা লাগবে, তাই ঠিক করা হল রাস্তাতেই দুপুরের খাবারটা খেয়ে নেব। ভোটের দিন হওয়ায় কোনো ভালো রেস্তোঁরা খোলা পেলাম না। ভাবছিলাম যে, যাহ্‌, তাহলে কি খালি পেটেই যেতে হবে! হঠাৎ একটা ছোট খুপরিমতন দোকান চোখে পড়ল। প্রথমে মনে হল যে, এখানে কি আদৌ কিছু পাওয়া যাবে? তারপরে ভাবলাম সবই তো বন্ধ, একবার চেষ্টা করে দেখি, যদি কিছু পাই। জিজ্ঞেস করলাম যে, দুপুরের খাবার কী আছে? এক মহিলার উত্তর এল, থাইপও আছে। থাইপও! সেটা আবার কী! পেটে প্রচুর খিদে তখন। বললাম যা আছে তাই দিন, খুব খিদে পেয়েছে। আহা! কী সুস্বাদু। অনেকটা মোমোর মতন খেতে এবং দেখতেও, কিন্তু সাইজে মোমোর থেকে অনেক বড়। পেটটা যেন পুরো ভর্তি হয়ে গেল। খাওয়াদাওয়ার পর্ব মিটিয়ে শেষ করে আবার গাড়িতে উঠে রওনা দিলাম গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে।

মানেভঞ্জন পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। দু'কিলোমিটার ওপরে খোপিধারাতে গিয়ে আমাদের গাড়ি থামল। ওখানে একটা হোমস্টেতে বুকিং করা ছিল। পরেরদিনের ট্রেকের প্ল্যান এবং সকলের জীবনের অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প করতে করতেই সন্ধ্যাটা কেটে গেল।

সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি করে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে গেলাম ট্রেক শুরু করার জন্য। সেদিনের গন্তব্য ছিল টংলু। ট্রেক শুরু করার ঠিক আগেই পাশং শেরপা এসে উপস্থিত। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক-এর পারমিট করিয়ে এনেছিলেন পাশংজি। উনিই পুরো ট্রেকটির গাইড - ভীষণ ভালো মনের মানুষ। আমাদের দলের সবথেকে বয়স্ক সদস্য ইলা দত্ত সিং, একষট্টি বছর বয়স ওঁর। পাশংজি ওঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানালেন ।

ঠিক দশটার সময় ট্রেক শুরু হল। খোপিধারার জঙ্গল দিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করলাম। সবার পিঠে ভারী ভারী রুকস্যাক। জঙ্গল পেরিয়ে চিত্রে পৌঁছলাম। পাশংজি বললেন এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার রওনা দেব। গন্তব্যস্থল তখনও বহুদূরে। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না চিত্রেতে, আবহাওয়া খারাপের দিকে যাচ্ছিল। পাহাড়ের আবহাওয়া বোঝা সত্যিই খুব মুশকিল। এক কাপ চায়ে চুমুক দিয়েই রওনা দিলাম। একটু যেন এনার্জি পেলাম চা খেয়ে। খুবই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম অনেকটা পথ হাঁটার পর। চিত্রে থেকে মেঘমা পৌঁছলাম। মেঘমাতে এসএসবি ক্যাম্পকে পেছনে ফেলে ওপরে উঠতেই আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে এল। এতটাই খারাপ যে এক ফুট দূরত্বের মানুষকেও দেখা যাচ্ছিল না – একে বলা হয় 'হোয়াইট আউট '। ঝোড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া, তার সঙ্গে বৃষ্টি। আহা কী অভিজ্ঞতা! এই না হলে অ্যাডভেঞ্চার! সবাই আপাদমস্তক ভিজে গেছি ততক্ষণে। অবশেষে টংলু পৌঁছলাম বিকেলে। সবাই ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছি। তাড়াতাড়ি ট্রেকার্স হাট-এ ঢুকে পোষাক বদলে ভিজে জামাকাপড় মেলে দিলাম খাটের ধারে, টেবিলের ওপরে, যে যেখানে পারলাম। সব কাজ সেরে গরম গরম স্যুপ পান করা হল। বাহ্! একটু যেন স্বস্তি হল। তারপর সোজা লেপের ভেতরে। বাইরে তখন শিলা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলাম যে আজকের দিনটা তো কাটল, কিন্তু আগামীকাল পরের গন্তব্যে পৌঁছব কী করে যদি এরকম আবহাওয়া থাকে! রাতের দিকে ঘরের ভেতর থেকেই শুনতে পারছিলাম বেশ জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বাইরে। একটাই বাঁচোয়া যে বৃষ্টি একদম থেমে গিয়েছিল। খোপিধারা থেকে টংলু অবধি সাড়ে নয় কিলোমিটার ট্রেক করে ফেলেছি প্রথম দিনে।

সকাল হতেই দেখি, আবহাওয়া পুরো পাল্টে গেছে। ঝকঝকে নীল আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আর তার সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালা। আহা! সে কী দৃশ্য! যত বেলা বাড়ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন রোদের আভায় তত বেশি চমকাচ্ছে। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম পরের গন্তব্যস্থলের দিকে- কালাপোখরি। টংলু থেকে টুমলিং এবং জৌবাড়ি হয়ে গৈরিবাস

ওখানে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে কালাপোখরির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। এখানে একটা পুকুর আছে যার জলটা কালো এবং নেপালি ভাষায় পুকুরকে বলা হয় পোখরি, তার থেকে এই জায়গাটার নামকরণ। টংলু থেকে কালাপোখরি অবধি সেদিন ১১ কিলোমিটার ট্রেক করে ফেলেছি।
কালাপোখরি থেকে পরের দিন সান্দাকফু যাওয়ার পালা। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম সান্দাকফুর উদ্দেশ্যে। কালাপোখরি থেকে সান্দাকফুর রাস্তা ভীষণ সুন্দর। বার বার যেতে ইচ্ছে করবে। জঙ্গলের মধ্যে ট্রেক করা থেকে শুরু করে গাছভর্তি রডোডেনড্রন ফুলের অপূর্ব রং, ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে ট্রেক করা অনেকটা উঠতেও হয় আবার নামতেও হয় সব মিলিয়ে মিশিয়ে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।

সকাল এগারটা পঞ্চাশ নাগাদ সান্দাকফু পৌঁছলাম ৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সবার কী আনন্দ। সবাই পেরেছি। যার জন্য এতদিনের অপেক্ষা, এতো কষ্ট করা, সেটাই শেষমেশ সফল হল। আমাদের ট্রেকটা স্পনসর করেছিল ডগলাস মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বারাকপুর। স্পনসর-এর ফ্ল্যাগ থেকে শুরু করে আরোহণ ওয়ান্ডারলাস্ট-এর ফ্ল্যাগ, ট্রাভেল ম্যানিয়াক-এর ফ্ল্যাগ, প্রেরণার ফ্ল্যাগ, ফটো অ্যাসোসিয়েশন অফ বারাকপুর-এর ফ্ল্যাগ এবং জাতীয় পতাকা ওখানে ডিসপ্লে করলাম। অনেক অনেক ছবি তোলা হল। এইসমস্ত কাজ শেষ করে ট্রেকার্স হাট-এ ফেরত গেলাম। ওখানে বসে প্রচুর গল্প-আড্ডা হল। সবাই খুব খুশি। কিন্তু এই খুশির মধ্যেও একটু মন খারাপ ছিল কারণ স্লিপিং বুদ্ধার দর্শন পাইনি। তবে মনে আশা ছিল যে পরের দিন ভোরে অবশ্যই পাব।
পরের দিন ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লাম স্লিপিং বুদ্ধার দর্শনে। আহা! কী দৃশ্য! মন ভরে গেল যখন চোখের সামনে কুম্ভকর্ণ, কুম্ভকর্ণ ইস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত শৃঙ্গগুলো দেখছিলাম। চোখের জল ধরে রাখতে পারছি না আবেগে, খুশিতে। কিন্তু মাথায় এটাও চিন্তা রয়েছে যে আজকে লম্বা ট্রেক করতে হবে, তাই বেশি সময় এখানে নষ্ট করা যাবে না। তাড়াতাড়ি না বেরোলে

মেঘমাতে দুপুরের লাঞ্চ। ট্রেকে হাঁটার সময় কখনও হেভি লাঞ্চ করা হয় না সাধারণত, কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হল। গরম ভাত, ডাল, পাঁপড়ভাজা দেখে বাঙালি লোভ সামলাতে পারলো না। সঙ্গে গ্লাসভর্তি রডোডেন্ড্রন ওয়াইন। ভুল করলে ফল তো ভুগতে হবেই। তাই মেঘমা পেরিয়ে চড়াইয়ে উঠতে সবার দম বেরিয়ে গেল। পিঠের স্যাক যেন পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। তবে একটু চড়াই ভেঙে উঠতেই মেঘ সরিয়ে শেষ বিকেলের নরম রোদ বেরিয়ে এল। স্নেহাশিস চিৎকার করে বলল, "সবাই পা চালাও... টংলু থেকে সানসেট দেখব।"

সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম গন্তব্যস্থলের দিকে। আজকের লক্ষ্য হল ফালুট। অনেক লম্বা রাস্তা। ২১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। তার মধ্যে অনেকটা উঠতে হবে পাহাড়ে। সান্দাকফু থেকে সাবারগ্রাম হয়ে পৌঁছলাম মলি, দুপুরের খাওয়া সারা হল। খেয়েদেয়ে আবার শুরু পথ চলা। বিকেলে পৌঁছে গেলাম ফালুট। আবার জয়ধ্বনি সবার মুখে,জাতীয় সঙ্গীতও গাইলাম ফালুট-এ। তাপমাত্রা তখন ভীষণ কমে গেছে। খুব ঠাণ্ডা, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। ফ্ল্যাগ ডিসপ্লে করে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ট্রেকার্স হাট-এ ফেরত গেলাম।

সান্দাকফু-ফালুট অভিযানের সাফল্যে পাশংজিকে অনুরোধ করা হল গোর্খেতে একটা ক্যাম্প ফায়ার-এর ব্যবস্থা করতে। অভিযানের সাফল্য উপভোগ করতে চাই সবাই মিলে। পাশংজি তাতে রাজিও হয়ে গেলেন। সেদিন অনেক রাত অবধি চলল গল্প-আড্ডা। আরও একটা দলও পৌঁছেছিল ফালুট। গল্পের আসরে তাদেরও আমন্ত্রণ জানালাম। অনেক নতুন আলাপ হল, বন্ধু হল, গল্প হল। সবশেষে নৈশাহার সেরে ঘুম। পরের দিন সকালে রওনা দিতে হবে গোর্খের উদ্দেশ্যে।
আবহাওয়া খারাপ হতে লাগল। পাশংজি তাড়া দিলেন যে যদি তাড়াতাড়ি না বেরোই, তাহলে আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে অভিযান করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ওঁর কথা মেনে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোতে যাব, ঠিক সেই সময়

রাস্তা পিছল হয়ে গেছিল। পা ফেলতে কিছুটা ভয়ও লাগছিল। মনে হচ্ছিল এই না পড়ে যাই। ফালুট থেকে নিচের দিকে নামতেই শুরু হল বৃষ্টি। ফালুট থেকে গোর্খে যেতে অনেকটা খাড়া উৎরাই নামতে হয়। জঙ্গলের রাস্তা তখন ভীষণ পিছল হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে অভিযান করতে গিয়ে কয়েকজন পড়েও গেল, চোটও লাগল কারো কারো। কিন্তু কিছু করার নেই। ওই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে গোর্খে ট্রেকার্স হাটে পৌঁছলাম বিকেলে।

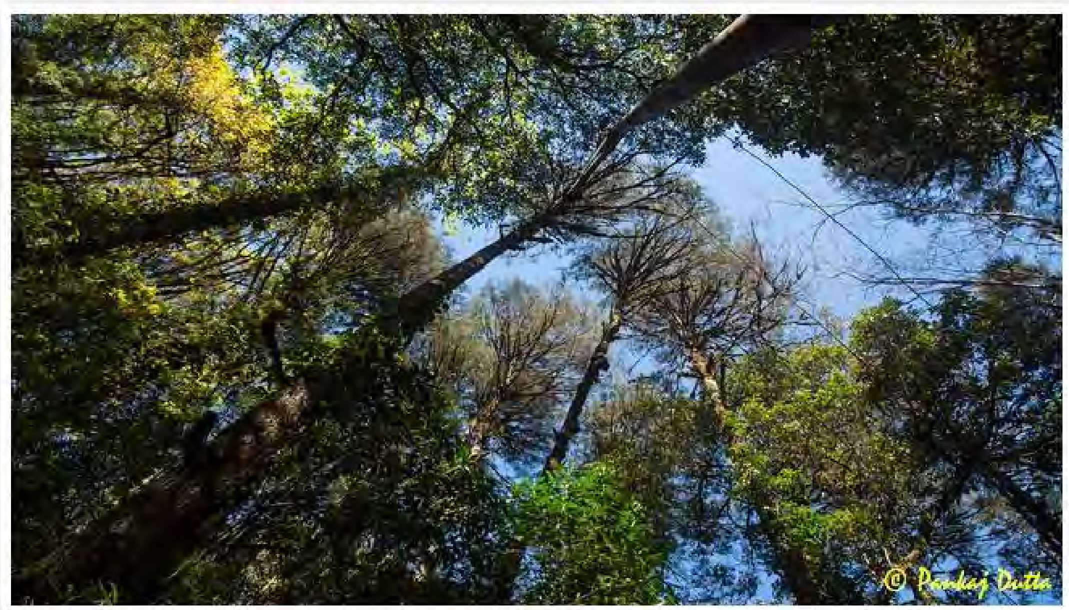

সেই একই অবস্থা। সবাই পুরো ভিজে গিয়েছি। আবার সমস্ত জামাকাপড় বার করে শুকানোর পালা। চা-বিস্কুট খেয়ে সন্ধ্যেবেলাতে হল ক্যাম্পফায়ার। আগুনের চারপাশে গোল করে ঘিরে বসে গান বাজনা নাচ হাসিঠাট্টা সবই চলল বেশ কিছুক্ষণ। তার মধ্যেই আগুনের চারপাশে ভেজা জামা কাপড় জুতোমোজা শুকোতে দেওয়া হল। অনেক রাত অবধি চলল এসব।

পরের দিন সকাল হতেই চা খেয়ে রওনা দিলাম রাম্মাম-এর উদ্দেশ্যে। রাম্মাম থেকে শেয়ার গাড়িতে শ্রীখোলা ব্রিজ। সেখান থেকে গাড়ি ঠিক করা ছিল আগে থেকেই, তাতে চেপে রিম্বিক, মিরিক হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন।

শেষের দিন সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পাহাড়েই থেকে যাই। কিন্তু ফিরে তো আসতেই হবে...

~ সান্দাকফু ট্রেক রুটম্যাপ || সান্দাকফু ট্রেকের আরও ছবি ~

আদতে ব্যারাকপুরের বাসিন্দা পঙ্কজ দত্ত হলদিয়ার আই ভি এল ধুনসেরি পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড-এ চাকরি করেন। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং ছবি তোলা ও বেড়াতে যাওয়া বিশেষ করে অ্যাডভেঞ্চার তাঁর প্যাশন। পঙ্কজ মনে করেন শুধু অর্থ রোজগারই বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। জীবন ভারী সুন্দর। বাঁচার জন্য যেটাই করতে হবে ভালোবেসে করতে হবে তাহলেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করা যাবে।

সুন্দরবন ভ্রমণ আর দুই বাঘের গপ্প

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

টর্চ হাতে নিয়ে অন্ধকারে ছাতে উঠতেই বুঝলাম আড্ডাটা খুব জমে গেছে। দীপ, বিশ্বনাথ আর সুবিত। পাশে চিকেন পকোড়ার প্লেট। পিংকির, আমার অবশ্য আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মাসীমা আর সুমন ক্লান্ত হয়ে ঘরেই বিশ্রাম করছিল।
গল্পের খেইটা ধরিয়ে দিল দীপ – ঘটনাটা পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্কের। পেঞ্চ-এর বেশিরভাগটাই মধ্যপ্রদেশের মধ্যে পড়ে, কিছুটা অংশ মহারাষ্ট্রের মধ্যে। তুরিয়া জোন জঙ্গলের কোর এরিয়ায়, এটাই সবথেকে জনপ্রিয় জোন। তুরিয়া গেটের কাছাকাছি কয়েকটা বাফার জোন আছে। সেগুলোর মধ্যে মহারাষ্ট্রের মধ্যে পড়ে খুরসাপাড় গেট, এটা তুরিয়া গেট থেকে ৪ কিলোমিটারের মধ্যে। পেঞ্চ ঘুরতে আসা পর্যটকরা সাধারণত তুরিয়া গেট আর তার আশেপাশের বাফার জোনের গেটেই সাফারি করে। সুবিত আবার শুরু করল –

আমার এই ঘটনাটা তুরিয়া জোনের গেট থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে, নাম রুখড় গেট। এটাতে সাধারণত নাগপুর আর তার আশেপাশের ট্যুরিস্টরা ভিড় জমায়। রুখড় গেট মধ্যপ্রদেশের মধ্যে অবস্থিত বাফার জোন। রুখড় গেটের কাছে যে বাঘটা নতুন এসে জুটেছে বলে খবর সেটা সেই সকালবেলায় একটা শুকনো নালার মধ্যে নেমে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করেও তার ঘুমভাঙার কোনো লক্ষণ নেই। এদিকে এই নতুন বাঘটা 'কিংফিশার' বলে একটা স্থানীয় পুরুষ বাঘকে তাড়িয়ে এই এলাকায় এসেছে। লাস্ট ছ-সাত মাস দেখাই নেই কিংফিশারের। সে ভেগেছে বলে খবর।
আমার সাথী ফকিরচাঁদ কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসর এবং ফোটোগ্রাফার কিশোরদা আর দিল্লির আরেক জঙ্গলপাগল ফোটোগ্রাফার মামরাজজি। মামরাজজি বহুবার এইসব জঙ্গলে এসেছেন। এখানকার জঙ্গলের রাস্তাঘাট আর খবরাখবর সব হাতের তালুর মতো জানেন। বয়স প্রায় বছর ষাটেক, মাসের কুড়ি-বাইশ দিন দেশের বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। দিল্লিতে ওঁর পঞ্চাশটি বাড়িতে ভাড়াটে থাকে। সেই ভাড়ার টাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে চলে যায়।
বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন বাঘটার ঘুম ভাঙলো না, মামরাজ বললেন তাহলে কুড়াইগড়ের দিকেই যাওয়া যাক। কুড়াইগড় জঙ্গলের অন্যপ্রান্তের পাশে একটা গ্রামের নাম। গেট থেকে কুড়াইগড় পৌঁছতেই ঘন্টাখানেক সময় লেগে যায় তাই সেদিকে সাধারণ ট্যুরিস্ট সাফারির গাড়ি প্রায় যায়ই না। যাওয়ার রাস্তার বেশিরভাগটা ছোটো ছোটো টিলার পাকদণ্ডী বেয়ে। খুবই ঘন পাহাড়ি জঙ্গল আর রাস্তাও বেশ খারাপ। কুড়াইগড়ে একটি মেল এবং একটি ফিমেল বাঘের নিবাস। বাঘিনীটি মারাত্মক রগচটা। কুড়াইগড় ফিমেলের বিভিন্নসময় বিভিন্ন সাফারি গাড়িকে তাড়া করার জন্য বদনাম আছে। ড্রাইভার, গাইডরাও কুড়াইগড় ফিমেলকে বেশ সমীহ করে চলে। কখন কী করে বসে ঠিক নেই। তাও কিংফিশার আর কুড়াইগড় ফিমেলের সন্ধানে আমরা সেদিকে রওনা দিলাম।
পাকদণ্ডী পথ বেয়ে ওপরদিকে উঠছি। অন্য কোনো গাড়ি নেই পথে। গাইড বলল, বাঘ তো আর রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে উঠবে না, সোজা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠবে। রাস্তার ওপরদিকে নজর রাখুন। আমরাও ঘাড় উঁচু করে ওপরদিকে এপাশ-ওপাশ দেখছি। হঠাৎ একটা শার্প টার্ন নেওয়ার পরেই দেখি রাস্তায় কয়েক হাত দূরেই বাঘ! আমরা হকচকিয়ে গেছি, বাঘটারও একই অবস্থা। খানিকক্ষণ দুপক্ষই চুপচাপ। ছবিটবি তোলা ভুলে গেছি তখন। তারপর সম্বিত ফিরতেই ড্রাইভার ব্যাকগিয়ারে চালাতে শুরু করেছে। আর বাঘটাও খপখপ করে এগিয়ে আসছে। আমরা পেছোচ্ছি, বাঘও এগোচ্ছে...বাঘ এগোচ্ছে, আমরাও পেছোচ্ছি...। এভাবে খানিকক্ষণ যাওয়ার পরে বাঘটা ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমরাও ছবিটবি তুলছি। তারপর বাঘটা আবার এগোচ্ছে, আমরা আবার পেছোচ্ছি। হঠাৎ দেখি আরেকটা গাড়ি এসে হাজির। তাতে ষণ্ডা ষণ্ডা সব লোকাল মানে নাগপুরী লোকে ভর্তি। তারা আমাদের পেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল। যেতেই একেবারে বাঘটার

ওদের গাড়ি শুঁকেটুকে আবার এগোতে শুরু করল। আবার আমাদের গাড়ির দিকে খপখপ করে এগোচ্ছে আর আমরা পেছোচ্ছি। পেছোতে পেছোতে একেবারে যেখানে সাফারির অন্য পর্যটকরা ছিল সেখানে পৌঁছে গেছি। আমরা তো এতক্ষণ ভেবে যাচ্ছিলাম যে কুড়াইগড় ফিমেল তেড়ে আসছে। কিন্তু কাছাকাছি এসে রাস্তার পাশের একটা পুকুরে নেমে গেল বাঘটা। তখন লক্ষ্য করলাম ওটা ফিমেল নয় মেল - কুড়াইগড় মেল। একটু পরে ওই গাড়িটাও নেমে এল। জানলাম যে বাঘ চলে যেতে ওই ষণ্ডা ষণ্ডা লোকগুলোই গাড়ি ঠেলে তুলে ফেলেছে।

অতিমারীর জন্য গত দুবছর প্রায় অন্তরীণ থাকার পর আজ সকালেই সুন্দরবনে এসে পৌঁছেছি। বাঘের দেখা মিলবে কিনা জানিনা। তাই শুরুতেই একটা বাঘের গল্প শুনিয়ে রাখলাম। তবে এখনো বাঘের দেখা না পেলেও সকাল থেকে শুরু হওয়া জলযাত্রায় পাখি দেখেছি বেশকিছু, আর হরিণ, কুমীর, ভোঁদড়, বুনো শুয়োরও। সেই গল্পটাই এবার শুরু করি।

বেলা এগারোটা নাগাদ গদখালি থেকে লঞ্চে উঠলাম – এম বি অভয়। আমি আর দীপ। মেয়ে আসেনি বলে মনটা একটু খারাপ। দীপের সহকর্মী ও বন্ধু বিশ্বনাথ, ওর স্ত্রী পিঙ্কি আর দুই মেয়ে। বিশ্বনাথের বন্ধু, দীপেরও পরিচিত সুবিত, ওর স্ত্রী সুমন আর শাশুড়ি মানে সকলের মাসিমা। ওদের মেয়েও আসতে পারেনি নতুন চাকরিতে ছুটি না পাওয়ায়। সুবিত, বিশ্বনাথ দুজনেরই নেশা বার্ড ফোটোগ্রাফি, ওদের পরিভাষায় 'বার্ডিং'। ওরাই আসছিল সুন্দরবনে। ডাকাডাকি করে আমাদের দুজনকেও দলে জুটিয়ে নিয়েছে। এর আগেও ওরা একাধিকবার এসেছে সুন্দরবনে -নিত্যানন্দের লঞ্চে। সুন্দরবনের এই জলজঙ্গল নিত্যানন্দের এতটাই চেনা যে সে লঞ্চ এমনভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড় করায় যাতে পাখি বা অন্য কোনো জন্তুর ছবি সবথেকে ঠিকঠাক ভাবে নেওয়া যায়। এবারে অবশ্য আমরা নিত্যানন্দের লঞ্চ পাইনি, আগেই তার বুকিং হয়ে গিয়েছিল। তবে এযাত্রার সব ব্যবস্থা ওরই করা। লঞ্চে রয়েছেন নিতাইয়ের মামা, তাঁকে আমরাও মামা ডাকছি। গাইডের নাম মানস মন্ডল। আরেকটি ছেলেও রয়েছে লঞ্চে - উৎপল। রান্না করছেন এক মহিলা যাঁকে মামাই এনেছেন, আর আছে লঞ্চের চালক। সবমিলিয়ে আমরা এই চোদ্দজন লঞ্চে রয়েছি।

শীতের ভোররাতে কলকাতা থেকে সবাই মিলে একটা টাটা উইঙ্গার-এ ক্যানিং হয়ে গদখালি ফেরিঘাটে যখন পৌঁছলাম ভালোই রোদ্দুর চারদিকে। লঞ্চে উঠতেই প্রথমে হাতে হাতে কচি ডাব, তার একটু পরেই লুচি তরকারি আর গুড়ের রসগোল্লা দিয়ে জব্বর ব্রেকফাস্ট হল।
নদীর নাম দুর্গাদোয়ানি, ওপারে হ্যামিল্টন সাহেবের স্মৃতিরঞ্জিত গোসাবা। এখনও লোকালয় ছাড়াইনি, দুপাশে যদিও ম্যানগ্রোভ অরণ্য শুরু হয়ে গেছে। যেতে যেতে চোখে পড়ল, ভাটায় জল নেমে গিয়ে প্লাস্টিকজঞ্জাল আটকে বিশ্রী হয়ে থাকা একটা গাছের ডালে বসে আছে সাদাকালো হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার। আরেকটু এগোতেই গাছের ডালে একটা সাদারঙের বক থুড়ি হেরন বসে রয়েছে।

ওদিকে গাইড মানস মন্ডল তখন সুন্দরবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভূমিকা শুরু করেছে, কলকাতার ৪০ কিমি পূর্বে গেটওয়ে অব সুন্দরবন ক্যানিং। সেখান থেকে গদখালির ফেরিঘাটের দূরত্ব ২৭ কিমি। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিমি - আরণ্যক এলাকা ৪২১০ বর্গ কিমি আর টাইগার রিজার্ভ ২৫৮৫ বর্গ কিমি, বাকিটা বসতি এলাকা। শেষ গণনা অনুযায়ী এখানের বাসিন্দা ছিয়ানব্বইটি বাঘ। একশো দুইটি দ্বীপের চৌত্রিশটিতে জনবসতি। ১৯৮৯ সালে জীব পরিমণ্ডল আর ১৯৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ সাইটের শিরোপা পেয়েছে -সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার

লাগিয়ে পাখি কিংবা অন্য কোনো জন্তুর নজরে এলেই লঞ্চটা সেদিকে নিয়ে যেতে বলছে। সুবিত বিশ্বনাথও তাদের ট্রাইপড মোনোপড ক্যামেরায় লম্বা লেন্স ফিট করে রেডি।

দুপাশে গোলপাতা,কেওড়া, বাইন, গেঁওয়া-র শ্বাসমূল আর ঠেসমূলওলা গর্জনের নিবিড় অরণ্য। ওরই মাঝে চোখে পড়ল জলের ধারে কমন স্যান্ডপাইপার, কাদাখোঁচা, ওয়ার্বলার, গাছের ডালে ব্ল্যাক ক্যাপড কিং ফিশার, নীল-সাদা কলার্ড কিংফিশার, হলুদে-নীলে কমন কিংফিশার, রঙিন বনমোরগ। কাদার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে মদনটাক। তীরে বুকে হেঁটে চলেছে বড়সড় ওয়াটার মনিটর। বেশ কয়েকটা বাঁদরও চোখে পড়েছে ইতস্তত।

এরই মধ্যে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত সুমন একটুক্ষণ লঞ্চের চালকের আসনে বসল। দুপুরে বেশ রোদ্দুর। সোয়েটার, জ্যাকেট খোলা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। লাঞ্চের আয়োজনও তোফা,আজ ভাঙর মাছ। জলখাবারের পর আপেল খাওয়াও হয়েছে একটা করে।

পাড়ের কাছেই জঙ্গলের মধ্যে এবার একটা হরিণ নজরে এল। নিবিষ্টমনে গা চুলকাচ্ছে। কে যেন মন্তব্য করল, হরিণটা এত আরামে আছে দেখে বোঝা যাচ্ছে বাঘ ধারেকাছেও নেই। একজায়গায় বালিতে বাঘের পায়ের শুকিয়ে যাওয়া দাগ চোখে পড়ল। আসলে বাঘ-হরিণ দেখা নয়। সুন্দরবনের আসল আকর্ষণ তার নদীর সমুদ্রোপম বিস্তার আর দুপাশে রহস্যময় জঙ্গল। সদ্য পড়া হাংরি টাইড-এর বিবরণগুলো মনে পড়ছিল। অত ভেতরে যাওয়া তো সম্ভব নয়। তবে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাই বা কম কী!

একজায়গায় এসে আবার পাগমার্ক চোখে পড়ল। এবারেরটা টাটকা। সেই নিয়ে ছবি তোলা আর জল্পনার মাঝেই মানসের ফোনে খবর এল বাঘ দেখা গেছে,বিশেষ দূরেও নয় - পাঁচশো মিটারের মধ্যেই। সেখানের কাছাকাছি একটিমাত্রই প্রমোদতরী ছিল, তার যাত্রীদের কারোর কাছেই ক্যামেরা ছিল না, দেখেছে তারাই। তাদের গাইড মোবাইল ফোনে ছবি তুলে আমাদের গাইডের ফোনে পাঠিয়েছে। একেই বলে কপাল। যেদিকে বাঘ দেখা গেছে, লঞ্চটাকে নিয়ে যাওয়া হল সেদিকে। কাছাকাছি পৌঁছে দেখি আরো অনেক লঞ্চ ভিড় করেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাঘ আর দেখা দিল না অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও।

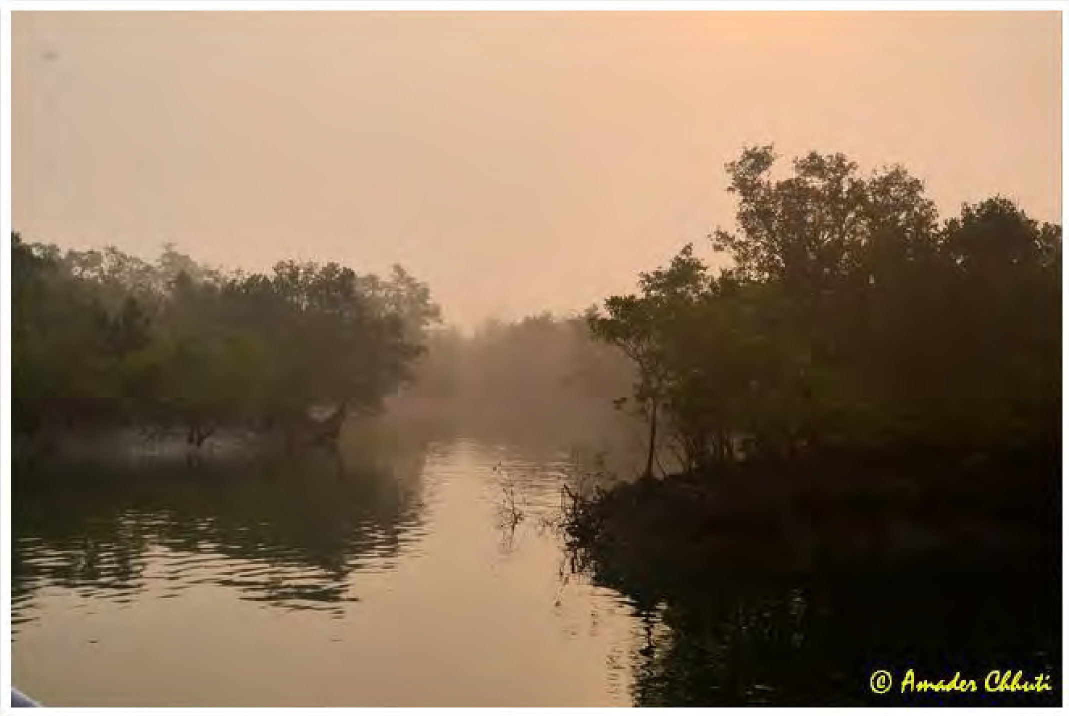

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জলের ওপর কমলা রঙের সূর্যটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে।
রাতে থাকা হবে বালিদ্বীপে। সজনেখালি পাখিরালারই একটা অংশ এই বালিদ্বীপ। লঞ্চ এবারে সেদিকপানে মুখ ঘোরাল।

ছোট্ট হোম স্টে। সামনের অল্প জমিতে মরশুমি ফুলগাছ, তিনটেই মাত্র ঘর, তার একটায় ব্যাগপত্র নিয়ে ঢুকে পড়ি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাশাপাশি দুটো চওড়া খাট প্রতি ঘরেই। অনায়াসে চারজন শুয়ে পড়তে পারবে। হাতমুখ ধুয়ে চিকেন পকোড়া আর চা খাই। তারপর ছাদের আড্ডায় সেই বাঘের গল্প শোনা।

পরদিন খুব সকাল সকাল বেরোনো হল। তখনও কুয়াশা কাটেনি। উদীয়মান সূর্যের লাল আভা কুয়াশা ঠেলে অল্প অল্প এসে পৌঁছাচ্ছে। বিদ্যাধরী নদী থেকে চলে এসেছি কুন্দিরী নদীর বুকে। দুপাশে হেঁতালের জঙ্গল। সকালে শঙ্খচিল চোখে পড়েছে। এখন দেখছি গাছের ডালে চুপ করে বসে রয়েছে একটা সার্পেন্ট ঈগল। একটু পরেই অবশ্য ডানা মেলল আকাশে। আরো খানিক এগোতেই একটা হরিণ নজরে এল। স্পটেড ডিয়ার। অদূরেই পাড়ের খোলা ঘাসজমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে,ঘাস খাচ্ছে। এরপর জলের ধারে, গাছের ডালে একে একে দেখা দিল পন্ড হেরন, ইগ্রেটরা। নদী ছেড়ে একটা

পাড়ে জঙ্গলের গা ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরাও এগোচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লঞ্চও। বেশ অনেকটা যাওয়ার পর জঙ্গলে মিলিয়ে গেল একসময়।

বাদামী রঙের উইস্লেল, লেসার হুইসলিং ডাক বা সরাল দেখতে দেখতে এগোতে লাগলাম। এক জায়গায় জঙ্গলের ধারে মন দিয়ে কাদা খুঁড়ছে বুনো শুয়োর। সাদা বকেরা ডানা মেলে জলের ওপর দিয়ে এপাড়-ওপাড় করে। ডালে ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে নীল-কমলা স্টর্ক বিলড কিংফিশার। রঙিন এই পাখিটা আর সাদা-কালো পাইড কিংফিসার বেশ কয়েকবারই দেখা গেল। নদীর পাড়ে কাদার মধ্যে আবার একটা রিভার মনিটর চোখে পড়ল। এটা আগেরটার থেকেও বড়, প্রায় ছোটখাটো কুমীরের মতো!

নদীর পাড়ে বড় একটা হাঁসের ঝাঁক, সেই লেসার হুইসলিং ডাক। যেতে যেতে আরেকটা চিতল হরিণ চোখে পড়ল, মাথা তুলে গাছের পাতা খাচ্ছে। আরেকটু এগিয়ে আবারও একটা হরিণ। জল থেকে জেগে থাকা শুকনো গাছের ডালে হলুদে-নীলে কমন কিংফিশার – যদিও ততটা কমন নয়, চিনিয়ে দিয়ে বলল সুবিত।

গতকাল যেখানে বাঘ দেখা গিয়েছিল, সেই জায়গাটায় আরেকবার যাওয়া হল। কিন্তু বৃথা অপেক্ষা। দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে এল। ফিরে এলাম বালিদ্বীপে।

ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বেরোলাম লাগোয়া গ্রাম দেখতে। ততক্ষণে শীতের বেলা ফুরিয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। হোম স্টের সামনের রাস্তাটা ধরে যেদিক থেকে এসেছিলাম, তার উল্টোদিকে হাঁটা দিলাম আমরা। রাস্তার দুপাশে ঝুপড়ি ঘর থেকে অল্প অল্প আলো দেখা যাচ্ছে। কারোর গৃহলাগোয়া ছোট্ট জমিতে কিছু গাছপালা রয়েছে।আলোহীন রাস্তায় মানুষজন-গাছপালা কিছুই আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। তবে যেটুকু আন্দাজ পেলাম গ্রামের অবস্থা বেশ খারাপ।

আজ সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে ভেজ পকোড়া। টিনের শেডদেওয়া বেশ বড়সড় খাওয়ার ঘরেই বসেছিলাম। সেখানে নিত্যানন্দ,তার বউ আর তাদের স্কুলের মেয়ে ছিল। তাদের সঙ্গে এটাওটা বলতে বলতেই দলের বাকিরা এসে গেল। অতএব সুবিতের মুখে আবার বাঘের গল্প –

সেবার পেঞ্চেরই বাফার জোন খুরসাপাড়ে গেছিলাম আমি আর স্বর্ণেন্দু। খুরসাপাড়ের কথা তো আগেই বলেছি। সেদিন ছিল ট্রিপের ছয় নম্বর সাফারি, বিকেলের ফ্লাইটেই নাগপুর থেকে ফেরার কথা। কেবল প্রথম সাফারিতটাতেই বাঘ দেখেছিলাম, সে-ও সেটা প্রায় না দেখার মতোই। বেশ দূরে ঘাসজমিতে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। ছবি তোলা সম্ভবই ছিল না। যাইহোক, শেষ সাফারির সময়ও ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু বাঘের দেখা মেলেনি। বেশ হতাশই হয়ে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে ঘন জঙ্গল থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছি। তার মধ্যেই স্বর্ণেন্দুর বাথরুম চেপেছিল জোর। তো গাইড বলল পাবলিক টয়লেট অনেকটা দূরে। সেখান অবধি যেতে যেতেই সাফারির সময় শেষ হয়ে যাবে। এক কাজ করা যেতে পারে। কাছাকাছিই একটা পরিত্যক্ত ঘর আছে, ফরেস্টগার্ডদের জন্য বানানো। সেখানে কাজ সেরে আসা যেতে পারে। আমরা তো তাতেই রাজি। কিন্তু সমস্যা হল একে তো জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থেকে নামা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আর সেদিন আরেকটা ব্যাপারও হয়েছে। রেঞ্জার তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরেও বাঘ দেখতে না পেয়ে বন্ধুরা তাঁকে খুব আওয়াজ দিয়েছে। তিনিও খেপে ব্যোম। যত রাগ সব ট্যুরিস্টদের গাড়িগুলোর ওপর ঝাড়ছেন। তিনি যদি আমাদের এই কান্ড টের পান তাহলে খুব মুশকিলে পড়ব। যাইহোক, সেখানে যাওয়া তো গেল। আমি গাড়িতে রইলাম, ড্রাইভার, গাইড আর স্বর্ণেন্দু নেমে অদূরের তারজালি দিয়ে ঘেরা ঘরটার পিছনদিকে গেল। চুপচাপ বসে আছি তো আছি। হঠাৎ সামনে তাকাতে দেখি বেশ কয়েক হাত দূরে বাঘ! সে আমায় দেখেনি,ধীরেসুস্থে আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে আসছে মাথা নিচু করে। আমার তো তখন হয়ে গেছে। ভাবছি বাঘটা লাফিয়ে এলে কী করব! গাড়ির পেছনের সিটে একটা লাঠি ছিল, যথাসম্ভব নিঃশব্দে হাতে তুলে নিলাম সেটা। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ! ওদিকে হঠাৎ দেখি, তিনমূর্তি নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি তো চেঁচাতে পারছি না। আওয়াজ না করে, হাত-মুখ নাড়িয়ে,ইশারাতে বলে যাচ্ছি বাঘ বাঘ। ওরা খেয়ালই করছে না, এগিয়ে আসছে গাড়ির দিকে। হঠাৎ কারোর নজর পড়ল গাড়ির দিকে, সঙ্গেসঙ্গে তিনজনই আমার হাত লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখে, বাঘ! সে যে কী অবস্থা, বলে বোঝানোর নয়। বাঘটা আরেকটু এগিয়ে ওপাশে একটা ডোবা ছিল, তাতে নেমে গেল। আর ওরাও সঙ্গেসঙ্গে দৌড়ে গাড়িতে উঠে এল। গাড়িও ছেড়ে দিল। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে তারপর শুরু হল ছবি তোলা। ছবিটবি তোলা হল। বাঘও ধীরেসুস্থে জল থেকে উঠে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। ঠিক তার পরেপরেই সেখানে আরো কয়েকটা গাড়ি চলে এল, রেঞ্জারের গাড়িও। রেঞ্জার সাহেব তো আমাদের ওপর তম্বি করছেন মাটিতে পায়ের দাগ দেখে। কে নেমেছিল? কে নেমেছিল? বেমালুম বললাম,জানিনা কিচ্ছু। রেঞ্জার সাহেবকে বললাম না যে বাঘ দেখেছি। ভয় ছিল সেটা বললে হয়তো আরো হ্যারাস করতে পারে। বললাম, সম্বর ডিয়ারের কল হচ্ছিল, তাই বাঘ দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। সেটা শুনে বললেন, 'সম্বর কা কল মতলব টাইগার ডেফিনিটলি ওঁহিপে হ্যায়।' বলে বন্ধুদের নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন আর আমরা মুচকি হেসে, হাম লোগোকো তো জলদি হি নিকলনা হ্যায়, বলে ওখান থেকে চলে এলাম।

পরেরদিন ভোরে বেরোনো হল দোবাঁকি ওয়াচটাওয়ারের উদ্দেশে। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা কলারড কিংফিশার, তারপরে ঝোপের ফাঁকে একটা বড়সড় বনমোরগ। গাছের মাথায় চুপ করে বসে আছে বক। জলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা

পড়া গাছের ডালে কলারড কিংফিশার। আকাশে ডানা মেলে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে সোনালি ডানার চিল। কাদায় শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে একটা কুমীর। দেখতে দেখতে দোবাঁকি পৌঁছে গেলাম।

বিদ্যাধরী নদীর পাশে দোবাঁকি - জালে ঘেরা বাঁধানো পথে ওয়াচটাওয়ার। টাওয়ারে ওঠার ঠিক আগেই কাদায় ছোট ছোট লাল আর হলুদ একদাঁড়া কাঁকড়া, আমাদের সাড়া পেয়েই হুড়মুড়িয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। ওয়াচটাওয়ারের দীর্ঘ ক্যানোপির নিচে সরকারি ম্যানগ্রোভ রোপণ প্রকল্পের গাছের চারার সারি। হাঁটতে হাঁটতে মাঝামাঝি পৌঁছে নিচে একটা হরিণও দেখতে পেলাম। টাওয়ারের উঁচু জায়গাটায় উঠলে সামনেই একটা জলাশয়। তাতে আবার একঝাঁক লেসার হুইসলিং ডাক, কখনও বসছে, কখনও আবার উড়ছে। নেমে এলাম অন্যপথে - স্যুভেনিরের দোকান, বনবিবির মন্দির আর দুটি সুন্দরী গাছ। সুন্দরবনের নামকরণ এই সুন্দরী গাছের থেকেই, কিন্তু আজ এখানে তারই সবথেকে আকাল।

দূর থেকে দেখি, লঞ্চটা আসছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। ঘাটের সিঁড়ির শেষ ধাপের পাশে সিমেন্টের ছোট স্তম্ভের ওপর বসে রয়েছে একটা স্টর্ক-বিলড কিংফিশার।

লঞ্চে উঠতেই একঝাঁক মৌমাছি কোথা থেকে ঘিরে ধরল। কেউ অবশ্য কামড় খাইনি। চলেও গেল তাড়াতাড়ি, যেমন হঠাৎ এসেছিল। খানিক এগোতেই কাদাজঙ্গলের মধ্যে আরেকটা কুমীর চোখে পড়ল। গাছগাছালির মাঝে হরিণের একটা ছোট দল বসে রয়েছে আরেকটু এগিয়েই।

গাছের ডালে বক, মাটিতে আবার একটা ভোঁদড়। পাড় আর জঙ্গলের ফাঁকফোকর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে শেষে জলে নেমে গেল ভোঁদড়টা। তারপরে আবার উঠে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। ডালে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে ছোট্ট পাখি ফটিকজল যার অন্য নাম কমন আইওরা। দেখি গাছের শিখরে বসে মাছরাঙা বড়সড় একটা ট্যাংরা মাছকে ঠোঁটে নিয়ে কব্জা করার কসরত চালিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে উড়ে গিয়ে একটা ন্যাড়া ডালের মাথায় বসল আর চেষ্টা করে যেতে লাগল ডালে আছড়ে মাছটাকে কাবু করার। চেষ্টায় কী না হয়! একটু বাদেই আস্ত মাছটা গিলে নিয়ে উড়ে চলে গেল।

তারপর বনবিবির দেশ, নিত্যানন্দ আর মানসদের দেশ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, কুমীর, হরিণ, পাখি আর মৌমাছিদের দেশ ছেড়ে আমরাও ফিরে এলাম।

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকার সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদনাবিভাগে কাজ করেছেন। বর্তমানে পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি স্বাধীন গবেষণায় রত। প্রকাশিত বই – 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা', 'আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত - উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা'। ভালোবাসেন বই পড়তে, গান শুনতে, লেখালেখি করতে আর বেড়াতে।

মায়াভরা পথে মদমহেশ্বর

পল্লব চক্রবর্তী

~ মদমহেশ্বরের তথ্য ~ মদমহেশ্বরের ট্রেকরুট ম্যাপ ~ মদমহেশ্বরের আরও ছবি ~

আমি কিন্তু কোনও ভক্তিরসের সন্ধানে এই পথ হাঁটিনি। সোনার কেল্লার মন্দার বোস রাজস্থানের রাজপুতদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "এরা তো যেখানে পেরেছে সেখানে একটা করে কেল্লা গুঁজে রেখেছে"। একই ভাবে দেবভূমি গাড়োয়ালে পাহাড়ের আনাচে কানাচে একটা করে মন্দির গোঁজা থাকবে আর পুরান-ইতিহাস-লোকগাথা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে – সে আর আশ্চর্য কী! মদমহেশ্বর ট্রেক মানেই ধারণা ছিল – বহু নিচে বয়ে যাওয়া মধুগঙ্গার গুঞ্জন, ছোট-বড় ঝরনা, জঙ্গলপথ আর সবার ওপরে বুড়ো মদমহেশ্বরে চৌখাম্বার স্বর্গীয় প্রতিবিম্ব। কিন্তু মদমহেশ্বর পৌঁছে বদলে গিয়েছিল সে ধারণা, বুঝেছিলাম হিমালয়ের একচ্ছত্রাধিপতি মহাদেবের অধিষ্ঠানের উপযুক্ত এই স্থান। সবুজ বুগিয়ালে পঞ্চকেদারের অন্যতম মদমহেশ্বর বা মধ্যমহেশ্বরের প্রাচীন মন্দির, তার একপাশে বুড়ো মদমহেশ্বরের খাড়া সবুজ ঢাল আর অন্যদিকে নাম না জানা এক ঝাঁক তুষারশৃঙ্গ, আকাশ-বাতাস এক স্নিগ্ধ পবিত্রতায় মাখামাখি। পরিষ্কার হল উপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যা – সত্য, সুন্দর আর শিব একই।
এই রে! শেষের ঘটনা আগে বলে ফেললাম! এই লেখাটা বরং শুরু করা উচিত ছিল মে মাসের শেষের দিকের কোন এক সময় থেকে। বেজায় গরম পড়েছে তখন কলকাতায়। অফিস ছুটির পর চায়ের আড্ডায় আমরা একমত হলাম যে অক্টোবরের ট্রেকিং-এ মদমহেশ্বরেই যাওয়া যাক এবার। আগেই পড়া ছিল উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মদমহেশ্বর নিয়ে অদ্ভুত সুন্দর লেখা। অবশ্য সময়ের হাত ধরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ট্রেক রুটের। এখন রাস্তা কঠিন কিছু নয়, গাইডেরও দরকার নেই। ফিবছর প্রচুর মানুষ যান মূলতঃ মদমহেশ্বর মন্দির দর্শনে। এরপর যথাসময়ে ট্রেনের টিকিট কেটে অপেক্ষার পালা। এরই মাঝে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল দুর্গাপুজো। দশমীতে দেবীকে বিদায় জানিয়ে তার পরদিন ঠিক দুপুরবেলা দুগ্গা দুগ্গা বলে কুম্ভ এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম।

শেষ আশ্বিনের পড়ন্ত বিকেলে ট্রেনের বাঁদিকের জানলা দিয়ে শিমুলতলার জনমানবহীন উথালপাথাল প্রান্তরে অদ্ভুত সুন্দর সূর্যাস্ত দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল হঠাৎ। ভারতীয় রেলের নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে কুম্ভ এক্সপ্রেস একেবারে সঠিক সময়ে হরিদ্বার পৌঁছে দিল। স্যাক ঘাড়ে করে প্রথমেই গেলাম পরেরদিন সকাল সাতটার গুপ্তকাশীগামী হিমগিরি এক্সপ্রেস বাসের টিকিট বুক করতে। আমাদের যেতে হবে রাঁশি গ্রাম। হরিদ্বার থেকে সরাসরি রাঁশি পর্যন্ত বাস বোধহয় নেই। তাই গুপ্তকাশী বা গৌরীকুণ্ডগামী যে কোনও বাসে কুণ্ড পর্যন্ত গিয়ে শেয়ার জিপ বা অন্য কোন বাসে রাঁশি চলে গেলেই হবে। বাসের একেবারে সামনের দিকের সিট বুক করে বিজয়ীর আনন্দ নিয়ে সোজা গেলাম বিষ্ণুঘাটের কাছে ভোলাগিরি আশ্রমে। ব্যাগপত্তর রেখে চোখেমুখে জল দিয়ে রাস্তার ভিড় ঠেলে সোজা ছুট হর কি পউরি ঘাটের দিকে, যা বহুবার দেখেও পুরনো হবার নয় – সেই গঙ্গা আরতি দেখতে।

পরদিন সকালে ঠিকসময়ে হরিদ্বার ছাড়ল বাস। জানলার পাশে বসে হাওয়া খেতে খেতে প্রকৃতি দর্শনের আশা উবে গেল অচিরেই, হৃষীকেশ পেরনোর ঠিক পরেই। চারধাম মহামার্গ বিকাশ পরিযোজনায় রাস্তার কাজ চলছে জোর কদমে, কাটা পড়ছে পাহাড়, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পাথর। এই উন্নয়নের ঠেলায় ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ, বাস চলছে ঢিমে তালে। সর্বাঙ্গ ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যখন কুণ্ড নামলাম তখন বিকেল চারটে বেজে গেছে। আমাদের ফেলে রেখে বাস চলে গেল গুপ্তকাশী হয়ে গৌরীকুণ্ডের দিকে। আমরা যাব উখিমঠ হয়ে রাঁশি গ্রাম, আরও প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা। খানিক পরেই রাস্তায় ধুলোর ঝড় উড়িয়ে এক বাস এল রাঁশি যাওয়ার। বেশ ভিড়, বসার জায়গা নেই। কনডাক্টর দাদা আশ্বাস দিলেন উখিমঠ গেলেই বসার জায়গা পাওয়া যাবে। সেই বাস থামতে থামতে যখন মনসুনা, উনিয়ানা হয়ে রাঁশি পৌঁছাল তখন ঘোর অন্ধকার চারিদিকে। সামনে যে থাকার আস্তানা পেলাম ঢুকে পড়লাম সেখানে। থাকার ব্যবস্থা খুবই সাধারণ, তাতে অবশ্য

কোনও অসুবিধা নেই। গরম জল জোগাড় করে সারা দিনের ধুলোময়লা ধুয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারে হেডটর্চ জ্বেলে চলে গেলাম রাঁশির বিখ্যাত রাকেশ্বরী মন্দির দেখতে। গাড়োয়ালের আর পাঁচটা প্রাচীন মন্দিরের মত একই গঠনশৈলী। এতক্ষণে বেশ ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে। মাথার ওপর প্রায় গোল চাঁদ উঠে পড়েছে, দুদিন পরেই কোজাগরী পূর্ণিমা, মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। ভাত, ডাল, আলুর তরকারি আর ডিমের ওমলেট দিয়ে জমিয়ে রাতের খাওয়া সেরে যখন মোটা কম্বলটা গায়ে টেনে নিলাম তখন গোটা রাঁশি গ্রাম একেবারে নিঝুমপুর।

পরদিন সক্কাল সক্কাল রেডি হয়ে গেছি তিনজন। রোগা চেহারা আর হাসি হাসি মুখ নিয়ে হাজির হয়ে গেছে মহাবীর। বলতে ভুলে গেছি, এই পথে কোনও গাইড দরকার না থাকলেও, আমার এক বন্ধু কমল সিংহ পানোয়ার বলে একজনের ফোন নাম্বার দিয়েছিল, বলেছিল –"পারলে ওকে নিস, স্থানীয় মানুষের রুটি রুজিরও তো দরকার আছে"। একেবারে হক কথা। তো সেই কমল পানোয়ার এখন গাইডের কাজ ছেড়ে উখিমঠে এক মোটর গ্যারাজে কাজ করে, সেই পাঠিয়েছে তার ভাই মহাবীরকে। হাঁটা শুরু করলাম যখন, ঠিক আটটা। পিচঢালা রাস্তাটা এখন রাঁশি ছাড়িয়ে আরও এক কিলোমিটার এগিয়ে গেছে, চাইলে এই রাস্তাটুকুও গাড়িতে যাওয়া যায়। আমরা তিনজন অবশ্য হেঁটেই চলেছি। এই পাকা রাস্তার শেষে প্রথম বার দেখা গেল চৌখাম্বাকে, নীল আকাশের গায়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মহাবীর বলে, ভাল করে দেখে নিন, এর দেখা আবার পাবেন একেবারে বুড়ো মদমহেশ্বর গিয়ে। এবার শুরু হল উতরাই পাহাড়ি পথ। একটা বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল চৌখাম্বা আর পিছনে পড়ে থাকল ছবির মত সুন্দর রাঁশি গ্রাম।

হাঁটছি এবার উতরাই পথ ধরে। তারপর যেতে যেতে যেতে, অনেক নিচে বয়ে যাওয়া এক নদীর সঙ্গে দেখা। নাম তার মধু গঙ্গা বা মদমহেশ্বর গঙ্গা। উল্টো দিকের পাহাড় বেয়ে নেমেছে বড়সড় এক ঝরনা। চারপাশে ঘন জঙ্গল, গাছে গাছে নাম না জানা ছোট ছোট পাখির কিচিরমিচির – সব মিলিয়ে অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। এই ভাবে ছয় কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে কখন যে ছোট্ট গ্রাম গোন্ডার পৌঁছে গেলাম খুব একটা টের পেলাম না। একটা খাবারের দোকানে আলুর পরোটার অর্ডার দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসলাম। মহাবীরের বাড়ি এই গোন্ডার গ্রামেই। সে একবার চট করে বাড়িতে দেখা করে আসতে গেল। এরপর কিলোমিটার খানিক যেতে না যেতেই এসে গেল লোয়ার বানতোলি। এই ট্রেক রুটের অন্যতম সুন্দর জায়গা বানতোলি। দুপাশ থেকে দুটো নদী – মার্কণ্ডেয় গঙ্গা আর মধু গঙ্গা এসে মিশেছে এখানে, উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে সেই মিলিত জলরাশি। চারপাশে লাল হয়ে আছে রামদানার খেত। বহু প্রাচীন লোহার ব্রিজ পেরিয়ে পিঠে ঘাসের বিপুল বোঝা নিয়ে চলেছে গাড়োয়ালি মহিলারা। চোখে পড়ল নদীর পাশে ছোট্ট একটা থাকার জায়গা, অবাক হয়ে দেখলাম তোবড়ানো টিনের সাইনবোর্ডে ট্যারাবাঁকা অক্ষরে বাংলায় লেখা আছে হোটেলের নাম - "আশুতোষ লজ"! মনে পড়ল বানতোলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এখানে কোথাও একটা বাড়ি করেছিলেন। সেই বাড়ি অবশ্য আগেই বিলীন হয়ে গেছে মহাকালের গর্ভে। অংশুমানদা বলল, "বুঝলি, ফেরার সময় এইখানে একরাত থাকব।"

লোয়ার বানতোলির পর থেকে রাস্তাটা পুরোপুরি চড়াই। এরপর এসে পড়লাম কয়েকটা থাকার জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা আপার বানতলি। এবার খেয়াল করলাম আকাশের নীল রং মুছে দিয়ে হানা দিয়েছে জলভরা কালো মেঘের দল। মেঘ-কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারপাশ। ঠিক করেছিলাম আজ যতটা পারি এগিয়ে যাব অন্তত নানু চটি পর্যন্ত তো যাবই। তাই যতটা দ্রুত সম্ভব এগতে লাগলাম। এদিকে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মহাবীর আশ্বাস দিল চিন্তার কিছু নেই আর একটু ওপরে উঠলে একটা টিনের শেড আছে, ওখানে দাঁড়ানো যাবে। আর একটু চড়াই ভেঙে উঠে ঢুকে পড়লাম সেই আশ্রয়ে আর ঠিক তক্ষুনি তুমুল বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙে। বৃষ্টিটা চলল ঠিক একঘণ্টা, তারপর যেভাবে হঠাৎ এসেছিল, সেই ভাবেই থেমেও গেল। আবার পথে নেমে পড়লাম।

বোধহয় দু কিলোমিটার আরও হেঁটেছি, চোখে পড়ল দুটো কী তিনটে ঘর নিয়ে একটা থাকার আস্তানা। বোঝা গেল খাদারা খাল এসে গেছি। দুপা এগিয়ে টিনের চাল দেওয়া আরও একটা মাথা গোঁজার ঠাই, এখানেও দুটো ঘর। আমরা এসব পেরিয়ে এগিয়েই যাচ্ছিলাম। এমন সময় মহিলা কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। "আইয়ে, চায়ে পিকে যাইয়ে…" - এক অল্পবয়স্ক গাড়োয়ালি দিদি ডাকছেন আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে বছর তিনেকের এক ফুটফুটে মেয়ে। সেই মিষ্টি মেয়ের নামটাও জেনে গেলাম –অংশিকা । বৃষ্টির পর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল, প্রাণটা চা-চা করছিল অনেকক্ষণ ধরে। সামনে পাতা নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চে বসে পড়লাম। পকেট থেকে চকলেট বার করে অংশিকাকে দিলাম, হাসিতে ভরে উঠল মুখ। মুহূর্তে আলোয় আলো হয়ে গেল চারদিক। দেখলাম মেঘ সরে গিয়ে দিব্যি রোদ্দুর উঠেছে। সামনে সোজা বেশ কিছু তুষারশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। মহাবীর বলে চলে, "ওইদিকেই নন্দীকুণ্ড, কাচনি খাল, সুজল সরোবর। আর ডানদিকের জঙ্গলে ঘেরা উঁচু পাহাড়টা দেখছেন? ওইখানে বিসুরি তাল।" জানতাম মদমহেশ্বর ছুঁয়ে অনেকগুলো বিখ্যাত ট্রেক রুট চলে গেছে, তার বেশিরভাগই কঠিন ট্রেক, কিছু তো আবার চ্যালেঞ্জিং ট্রেক। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে চারপাশটা দেখতে থাকি। বৃষ্টির পর আশেপাশের উঁচু পাহাড়গুলোতে বরফ পড়েছে, আলতো রোদ্দুর চুঁইয়ে পড়ছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে, এদিক-ওদিক দু চারটে বুনো ফুল ফুটে আছে, দূরে কোথাও পাখি ডাকছে… ভারি শান্ত, নিরুপদ্রব জায়গা এই খাদারা খাল। তিনজনেরই বড় ভালো লেগে গেল । ঠিক করলাম, আজ আর এগিয়ে কাজ নেই। এখানেই থাকব। চারপাশ ঘুরে, থাকার আস্তানায় ফিরে দেখি অবাক কাণ্ড। ঘরের সামনে পাথরের চাতালে রোদ্দুর এসে পড়েছে আর সেখানে প্লাস্টিক শিটের উপর শোয়ানো আছে এক ছোট্ট শিশু। জানা গেল দিদির এই ছেলের বয়স সবে তিনমাস। হাত-পা ছুড়ে আপন মনে খেলা করতে থাকে দেবভূমির এই দেবশিশু। অবাক হয়ে যাই শুনে যে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় তিন বছরের শিশুকন্যা আর তিনমাসের সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে নিয়ে একা থাকেন দিদি। রান্না করেন, জল আনেন, অতিথি দেখভাল করেন। তাঁর স্বামী রুদ্রপ্রয়াগের দিকে কোন এক দোকানে কাজ করেন। দিদিদের বাড়ি গোন্ডার গ্রামে – এখান থেকে চার কিলোমিটার দূর। আর কয়েকদিন পর মদমহেশ্বর মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তিনি হোটেল বন্ধ করে পুত্রকন্যা নিয়ে গোন্ডার গ্রামে ফিরে যাবেন।

দেখতে দেখতে ফুরিয়ে আসে দিন, ক্রমশ চেপে ধরে প্রবল ঠাণ্ডা, স্পষ্ট হতে থাকে কাছাকাছি কোনও ঝরনার আওয়াজ,

একঘেয়ে সুরে ডাকতে থাকে ঝিঁঝিঁ। একসময় উঠে পড়ে কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিনের গোল চাঁদ। মায়াবী আলোতে ভেসে যেতে থাকে নিঝুম চরাচর। এরই মাঝে দিদি যত্ন করে বানান রুটি, ডাল আর আলুর তরকারি। কাঁপতে কাঁপতে খাওয়া শেষ করে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ি। কালই পৌঁছে যাব মদমহেশ্বর... সারাদিনের ক্লান্তির পর কখন যেন চোখের পাতা বুজে আসে।

সব পাহাড়ে সব সকালগুলো মোটামুটি একইরকম হয়। মাথার ওপর বিশাল আকাশটা ঘন নীল রং ছড়াতে থাকে, নরম সোনালি রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ে আনাচে কানাচে আর কনকনে ঠাণ্ডা লেপ্টে থাকে সারা গায়ে। এমনই সকালে চা খেয়ে আবার পথে নেমে পড়লাম। কালকের থেকেও উৎসাহ আজ অনেক বেশি। চড়াই পথ বেয়ে হাঁটতে থাকি তিনজন। পথ ভালোরকম চড়াই হলেও সুন্দর ভাবে পাথর দিয়ে বাঁধানো। রাস্তায় খুব বেশি ট্রেকার চোখে পড়েনি, বরং পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুং টাং শব্দে ঘোড়া চলাচল করছে। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে অনেকে চলেছেন মদমহেশ্বর। এমনই কাউকে বোধহয় মদমহেশ্বর নামিয়ে খালি ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসছিলেন শিব সিংহ পানোয়ার। ফেরার পথে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মৌজ করে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছিলেন। আলাপ করায় একগাল হেসে উঠলেন। জানালেন চারটে ঘোড়া ছাড়াও ওনার এক হোটেল আছে লোয়ার বানতোলিতে, একদম লোহার সেতুর কাছে, নদীর পাশে –আশুতোষ লজ, ফেরার সময় ওখানে থাকলে উনি খুব যত্ন করবেন। নিজের খেতের সবজি রান্না করবেন। আমরা তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, এ যে একেবারে টেলিপ্যাথি! কালই আসার সময় অংশুদা বলেছে ফেরার সময় ওখানেই থাকব। সমস্বরে বললাম আমরা আগামীকালই যাচ্ছি আপনার ওখানে। খুশিতে শিব সিংহ পানোয়ার বিড়ি ফেলে ঘোড়া নিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। যেতে যেতে আবার বলে গেলেন – আসবেন কিন্তু বাবু, দেখবেন কেমন যত্ন করি আপনাদের।

খাড়া চড়াই পথ বেয়ে একসময় পৌঁছে গেলাম নানু চটি। একটাই মোটে থাকার আস্তানা, আশেপাশে ঘন জঙ্গল। গরম ম্যাগি আর চা দিয়ে এখানে ব্রেকফাস্ট সারা হয়ে গেল, আর সেই সাথে বাড়তি পাওনা একটু বিশ্রাম। এরপর জঙ্গল আরও ঘন হয়ে এল। চারপাশে কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব। মহাবীরকে বলা হল সঙ্গে হাঁটতে। এইভাবে চলতে চলতে পেরিয়ে গেলাম এই পথের শেষ চটি। এবার সামনে শুধু মদমহেশ্বর। এতক্ষণ চড়াই ভেঙে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। প্রতিবার বাঁক ঘুরতেই মনে হচ্ছে এবার বুঝি এসে গেছি মদমহেশ্বর। জানি, মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করে বিশেষ লাভ নেই। জিজ্ঞাসা করলেই ভদ্রলোকের মত এক কথাই বলবে- "ব্যাস্, থোড়াসা আগে"। তারপর একসময় সত্যিই এক পাকদণ্ডীর শেষে চোখের সামনে ভেসে উঠল এক ক্যানভাস। তারপর সেই ক্যানভাসে একে একে ফুটে উঠতে লাগল প্রায় সমতল এক সবুজ ঘাসের গালিচা, গাড়োয়ালি গঠনশৈলীতে তৈরি এক প্রাচীন মন্দির, বাঁদিকে বুড়ো মদমহেশ্বরের একদম খাড়া ঢাল আর ডানদিকে গভীর খাদের ওপারে বেশ কিছু বরফমাখা অনামী শৃঙ্গ, আর মাথার উপর ঘন নীল আকাশ।

পিঠ থেকে স্যাক খুলে সবাই বসে পড়লাম ঘাসের উপর। আঃ ! শান্তি। পৌঁছে গেছি মদমহেশ্বর, পঞ্চকেদারের অন্যতম কেদার যার উচ্চতা সাড়ে এগারো হাজার ফুটের মত। পরিবেশ অদ্ভুতরকম শান্ত, কেবল হাতেগোনা কয়েকজন মানুষের উপস্থিতি। সব মিলিয়ে জায়গাটাতে একটা স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব অনুভব করা যায় সহজেই। তার ওপর আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। মন্দিরের আশেপাশে অল্প কয়েকটা ছোটখাটো থাকার জায়গা। তারই একটাতে ঢুকে স্যাক রেখে চলে গেলাম পুজো দিতে।

দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য অন্যত্র। এখানে নাকি নিয়ম থাকার জায়গা যাত্রীরা নিজেদের পছন্দমত ঠিক করতে পারবে, কিন্তু কোথায় খাবে তা নাকি কী এক কমিটি ঠিক করে দেবে। যাক, এখানেও সিন্ডিকেট ঢুকে পড়েছে তাহলে। তা, রোদে বসে ভাত, ডাল আর শাক সিদ্ধ তৃপ্তি করেই খেলাম। খেতে খেতে সামনে বুড়ো মদমহেশ্বর ওঠার খাড়া ঢালটা চোখে পড়ে। আগামীকাল শেষ রাতে উঠতে হবে এই ঢাল বেয়ে, পৌঁছাতে হবে সূর্যোদয়ের আগেই। একনজরে দেখলেই বোঝা যায় কাজটা খুব একটা সোজা নয়। এখন প্রার্থনা একটাই – কাল ভোরে যেন আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত থাকে।
সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি শুরু হল হি হি করে। এতটাই ঠাণ্ডা যে মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে যাওয়ার মত সাহস কারও হল না। কোনোরকমে রাতের খাবার গলাধঃকরণ করে যখন শুয়ে পড়লাম তখন সবে সাড়ে সাতটা বাজে।

ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ করে। দরজার ফাঁক দিয়ে বরফ ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে চাঁদের আলোও এসে পড়েছে মেঝের ওপর। ঘড়িতে সময় সাড়ে তিনটে। এমনিতে চারটের সময় অ্যালার্ম দেওয়া ছিল। ঝটপট উঠে রেডি হয়ে নিলাম। যেখানে যত জল ছিল সবার ওপরেই কাচের মতো পাতলা বরফের আস্তরণ পড়েছে। খানিক পরেই মহাবীরের গলা, "দাদা, চলিয়ে।" কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে এক অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে চারপাশে। মনে হচ্ছে মহাবীরের পিছু পিছু এক রূপকথার দেশে চলেছি আমরা তিনজন।

মন্দিরকে পাশ কাটিয়ে বামদিকের খাড়া ঢালে উঠতে থাকি একে একে। মহাবীর আগে আগে গিয়ে পথ দেখাতে থাকে। কাল পথ যতটা কঠিন বলে মনে হচ্ছিল, এখন অতটা কঠিন লাগছে না। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকি। ক্রমে চাঁদের আলোয় দেখা নিচের মদমহেশ্বর মন্দির ছোট হতে থাকে। আমরাই বোধহয় প্রথম যাত্রী বুড়ো মদমহেশ্বরের। বহু নিচে আরও কিছু টর্চের আলো দেখা যায়, বোঝা যায় অন্যরাও এবার হাঁটা শুরু করেছে। আরও বেশ খানিকটা ওপরে উঠতে, প্রথমবার চোখে পড়ল চৌখাম্বা, চাঁদের আলোয় রুপোর মত চকচক করছে তার সারা শরীর। ব্যস! বাকি পথটুকু একরকম লাফিয়ে শেষ করে যেখানে পৌঁছালাম, সেটা প্রায় সমতল বিশাল এক তৃণভূমি, গাড়োয়ালি ভাষায় যাকে বলে বুগিয়াল। এখনও সূর্য উঠতে বেশ কিছুটা সময় বাকি। শেষরাতে কোজাগরী পূর্ণিমার ডুবুডুবু চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মত উজাড় করে দিচ্ছে জ্যোৎস্না, আর সেই স্নিগ্ধ মায়াবী আলোতে ধুয়ে যাচ্ছে চারপাশ, ভেসে যাচ্ছে চৌখাম্বা, ভেসে যাচ্ছে বিশ্বচরাচর।

বুগিয়ালের মাঝখানে পাথরের তিন দেওয়ালের মাঝে শিবের ছোট্ট আশ্রয় স্থল। ইনিই বৃদ্ধ মদমহেশ্বর। সামনে ছোট্ট জলাশয়। এই কনকনে ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেছে তার জল। এর নাম ব্যাস কুণ্ড। বরফ হয়ে গেছে ঘাসে পড়া রাতের শিশিরও। সেই জন্য গোটা বুগিয়ালের রং এখন সবুজের পরিবর্তে সাদাটে লাগছে। উত্তর দিকে যেখানে এই বুগিয়ালের শেষ, সেই দিকেই আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চৌখাম্বা। এতটাই কাছে, মনে হয় যেন জোরে ঢিল ছুড়লে ঠিক গিয়ে পড়বে। তারপাশে দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট মান্ধানি পর্বত, আর পশ্চিম দিকে বেশ কিছুটা দূরে উঁকি দিচ্ছে কেদার ডোম। এই সবই দেখছি চাঁদের আলোতে। জ্যোৎস্না যে এত ফুটফুটে হতে পারে আগে জানতে পারিনি।
ক্রমে ক্লান্ত চাঁদ ডুবে গেল পাহাড়ের আড়ালে, আর ঠিক একই সময়ে সোনালি রং ধরল চৌখাম্বার চূড়াতে, তারপর সে রং ছড়িয়ে পড়ল কেদার ডোমে। অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছি সবাই। কানে যেন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি – ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ...বাতাস মধু বহন করছে, নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করছে। ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হোক। রাত্রি মধু হোক, ঊষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হোক। সূর্য মধুময় হোক"।

যখন আবার নেমে এলাম মদমহেশ্বর, সোনালি রোদ্দুরে ভেসে আছে চারপাশ। ম্যাগি আর চা খেয়ে পিঠে স্যাক নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম। একটু এগোতেই পথের বাঁকে হারিয়ে গেল মদমহেশ্বর মন্দির। আজ আমাদের সোজা গন্তব্য

বানতোলির আশুতোষ লজ। উতরাই পথে গল্প করতে করতে তিনজন পৌঁছে যাই লোয়ার বানতোলি। আমাদের দেখে একগাল হেসে ওঠেন শিব সিংহ পানোয়ার। স্ত্রী, সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ পুত্র আর চারটে ঘোড়া –এই নিয়ে সুখের সংসার শিব সিংহজির। আমাদের চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখান। একেবারে ছবির মতো জায়গা। বাড়ির সামনে দিয়ে উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে চৌখাম্বার দিক থেকে আসা মার্কণ্ডেয় গঙ্গা, আর পিছন দিকে নন্দীকুণ্ড থেকে উৎপন্ন মদমহেশ্বর গঙ্গা বা মধু গঙ্গা। কাছেই মধুগঙ্গা পার করার লোহার ব্রিজ। পাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নানা রকম শাক সবজির চাষ করেছেন শিব সিংহ –কুমড়ো, আলু, টমেটো , মিঠে করলা, লঙ্কা এই সব। তার পাশেই লাল হয়ে আছে রামদানার খেত। কাছেই কয়েকটা আখরোট গাছ। শিব সিংহজি গর্ব করে বলেন, "আমাদের শুধু চাল আর তেল মশলা কিনতে হয়।" দুম করে মনে পড়ে গেল উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। শিব সিংহ জানলেন ওনার পিতাজীর সাথে ওই বাঙালীবাবুর বহুৎ জান পহেচান ছিল। উমাপ্রসাদের বাড়ি কোথায় ছিল সেটাও দেখালেন। সে বাড়ির যে সামান্যটুকু অবশিষ্ট ছিল, ২০১৩ সালের বন্যায় সেটুকুও চলে যায় মার্কণ্ডেয় গঙ্গার গর্ভে। কথা বলতে বলতে ঘোড়ায় চেপে মদমহেশ্বর যাওয়ার এক খদ্দের জুটে গেল শিব সিংহ পানোয়ারের। "আপনারা ভালো করে বিশ্রাম করুন, আমি এই যাব আর আসব" – ঘোড়ার পিঠে সওয়ার বসিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হলেন শিব সিংহজি।

পরদিন সকালে বানতোলিকে বিদায় জানিয়ে হাঁটা শুরু করলাম রাঁশি গ্রামের দিকে। সেখান থেকে সকাল দশটায় একটাই বাস ছাড়ে রুদ্রপ্রয়াগের উদ্দেশ্যে। ধরতেই হবে সেই বাস। একসময় মদমহেশ্বর ট্রেক রুট পিছনে ফেলে পৌঁছে যাই রাঁশি। ফাঁকা বাসে উঠে বসি। বাস ছাড়ার সময় চলে আসে। মহাবীর বিদায় জানিয়ে বলে, " আবার আসবেন।" হঠাৎ করে মন খারাপ করতে থাকে। বুড়ো মদমহেশ্বরে দেখা সেই অপার্থিব জ্যোৎস্না আর অলৌকিক সূর্যোদয় যা আর জীবনে দেখা হবে না, নাকি খাদারা খালে দেখা তিন বছরের অংশিকা আর তার তিন মাসের ভাই – যারা বড় হবে ভীষণ নির্জনতায় পাহাড়ের কোলে, নাকি মহাবীর, প্লাস্টিকের চটি আর মলিন জ্যাকেট পড়ে সর্বাঙ্গে অভাবের ছাপ নিয়েও যে সব সময় হাসে – কার জন্য এই মন খারাপ ঠিক বুঝতে পারি না। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে বাস এগোতে থাকে।

~ মদমহেশ্বরের তথ্য ~ মদমহেশ্বরের ট্রেকরুট ম্যাপ ~ মদমহেশ্বরের আরও ছবি ~

পদার্থবিজ্ঞানের স্নাতক পল্লব চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য কর দফতরের আধিকারিক। ভালোবাসেন নানা ধরণের বই পড়তে। নেশা ব্যাগ ঘাড়ে করে পরিবারের কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কাছে বা দূরের ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়া। বেশি পছন্দের পাহাড় আর বন। এক সময় দার্জিলিং-এ চাকরি করেছেন বেশ কিছু দিন। সেই থেকে পাহাড়ের সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া।

Comments

কদিনের কুর্গ

প্রজ্ঞা পারমিতা

ইংরেজদের স্কটল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দিত কুর্গের নিসর্গ। সেখানের অধিবাসীরা দক্ষিণ ভারতের একমাত্র জনগোষ্ঠী যারা দ্রাবিড় নয়। দক্ষিণ-গঙ্গা নামে অভিহিত কাবেরী নদীর উৎপত্তি কুর্গ-এ, যা এক সুবিখ্যাত হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। কুর্গি রান্নার স্বাদ একবার পেলে জীবনে ভোলা সম্ভব নয়।
এহেন স্থানমাহাত্ম্যের যেকোনো একটির জন্যই সেখানে উপস্থিত হওয়া যায়। অন্যসব আকর্ষণের প্রতি গয়ংগচ্ছভাব দেখালেও কুর্গি-কুইজিন আমাকে প্রবল ডাকাডাকি জুড়ে দিল। সকাল-সন্ধে কারণে অকারণে পান্ডি কারি আর আক্কি রুটির স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। চোখ বুজলেই মনের আঙিনায় মাখনে নেয়ে ওঠা সারা অঙ্গে গোলমরিচমাখা ক্যাপসিকাম দেখতে লাগলাম। অগত্যা কুর্গ বেড়াতে যাওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। তাই এক সেপ্টেম্বরে দিনতিনেকের অবিভক্ত মনোযোগসহ অবকাশের আয়োজন করে কুর্গের দরজায় কড়া নাড়লাম।

পশ্চিম কর্ণাটকের একটি অরণ্য-পর্বতময় জেলা কুর্গ, যার আসল নাম কোডাগু। ইংরেজদের উচ্চারণ বিকৃতির ফলে কোডাগু হয়ে গেছে কুর্গ আর প্রাচীন কুর্গ রাজ্যের রাজধানী মাদিকেরি হয়ে গেছে মারকারা। অবশ্য নামে কী আসে যায়, যা সুন্দর তাকে যে নামেই ডাকো সুন্দরই থাকে। কুর্গের নিসর্গ যেমন অপরূপ তেমনই সুদর্শন এখানকার অধিবাসী কোডাভা জনগণ।

আদিগন্ত ঢেউ খেলানো সবুজ উপত্যকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ আইসিএস অফিসার হিলটন ব্রাউন ১৯২২ সালে ব্ল্যাকউড'স ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন, "A comparison of Coorg with Scotland is really almost inevitable. Scotland in the days of Sir Walter and Coorg at this present moment are not nearly so dissimilar as latitude and distance would suggest. Both have grand and regal highlands with sturdy mountain dwelling races; … Both are rich in folklores and folksongs, in hearts ready for hospitality and hands ready for the swords." [The Astonishing Land of Coorg] একশ বছর আগে লেখা হিলটন ব্রাউনের প্রবন্ধ থেকে এই বাক্য ক'টি তুলে আনার উদ্দেশ্য এরমধ্যে ধরা পড়েছে কুর্গের নিখুঁত পরিচয়। কোডাভারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা জাতি। ব্রিটিশ আমল থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখতে তাদের লাইসেন্স লাগে না। এক বিশেষ ধরণের কুর্গি ছোরা 'পিচেকাট্টি' কোমরবন্ধে গুঁজে রাখাটা তাদের বেশভূষার অঙ্গ। প্রাচীন কুর্গ রাজ্যের 'কোট অফ আর্মস' ছিল দুটি ক্রসকরা পিচেকাট্টি যা এখন ভ্রমণস্মারক হিসেবে সংগ্রহযোগ্য। কুশলী যোদ্ধা হওয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পদ এঁরা। জেনারেল কারিয়াপ্পা, জেনারেল থিমাইয়াহর মতো বহু সামরিক ব্যক্তিত্ব কোডাভা জাতির গর্ব।

প্রথমেই কোনও শহরে আস্তানা না গেড়ে কোদাভাদের আদি অকৃত্রিম জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিলাম আমরা। তাই ব্যাঙ্গালোর-মাইসোর-মাদিকেরি হাইওয়ে (NH 275) ছেড়ে দিয়ে কেএসএইচ ৯০ (KSH 90) দিয়ে গোনিকোপ্পা হয়ে কুর্গের দক্ষিণ বিন্দুতে এক ছোট গ্রাম কুর্চির পথ ধরলাম। গোলমরিচ-এলাচ-দারচিনি-জায়ফল ইত্যাদি মশলা, নানা ধরনের ওষধি এবং কফির দিগন্তবিস্তৃত খেতের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ছোট ছোট জনপদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলল। এইসব খেতমালিকদের বাস বাগানলাগোয়া বাড়িতে এবং তাঁরা যে হোমস্টের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন সেগুলোই কুর্গ ভ্রমণে 'দি বেস্ট'। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই সিদ্ধান্ত জানাতে দ্বিধা নেই। আমরা তেমনই ব্যবস্থা করেছিলাম।

বাঙ্গালোর থেকে সকাল ছটায় রওনা দিয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ কুর্চি কফি এস্টেটের মালিকের একতলা বাংলোর সামনে আমাদের গাড়ি থামল। গাড়ির শব্দ থামতেই বুঝলাম জায়গাটা কতটা নির্জন। একরাশ নৈঃশব্দ্য ঘিরে ধরল যেন। একটু ধাতস্থ হতে বুঝলাম যে আসলে মানুষের কোলাহল নেই শুধু, প্রাকৃতিক শব্দ আছে। কানে আসছে দূরের ঝরনার জলের আওয়াজ, পাখির ডাক। সেসব থেকে আপাতত মন সরাতে বাধ্য হলাম। এক সুদর্শন বৃদ্ধ আমাদের অভ্যর্থনা করতে বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আরেকজন লোকও গাড়ির কাছে উদয় হয়েছে খেয়াল করিনি, বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্থানীয় ভাষায় তাকে মালপত্রসংক্রান্ত নির্দেশ দিয়ে আমাদের বাংলোর ভিতরে আসতে অনুরোধ করলেন। কথাবার্তা সব ইংরেজিতেই হচ্ছিল। একটি প্রশস্ত বসার ঘরে ঢুকলাম আমরা দুই বাঙালি দম্পতি - আমি, রাজীব, মিতালী ও কৌশিক। বসতে অনুরোধ করে তিনি ভিতরে গিয়ে ফিরে এলেন একজন মহিলাকে সঙ্গে করে। বললেন, "We are Mr. and Mrs. Ganesh. I am a coffee planter but she is a retired teacher. As a host we are so glad to have you here. You people are the first Bengali couples in my home." গদগদ হয়ে আনন্দটা যে উভয়ত তা জানালাম।

কোডাভাদের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীনাম ও ব্যক্তিনাম হয় যা একেবারেই হিন্দু নামাবলি থেকে ভিন্ন। যেমন জেনারেল কারিয়াপ্পার নাম কোদানদেরা মাডাপ্পা কারিয়াপ্পা। পুরুষদের ক্ষেত্রে আপ্পা বা আন্না দিয়ে শেষ হয়, মেয়েদের আম্মা বা আক্কা। কিন্তু এখনকার যুগে ব্যক্তিনাম আর সেরকম রাখা হয় না। যেমন রবিন উত্থাপ্পা, অশ্বিনী নাচাপ্পা। তবে এই প্রবণতা আধুনিক কালের - আন্দাজ বছর পঁয়ষট্টি বয়সি ভদ্রলোকের এমন সহজ নাম দেখে নানারকম প্রশ্ন জাগছিল আমার মনে। গোড়াতেই নাম নিয়ে পড়াটা বাড়াবাড়ি হবে ভেবে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছিলাম। কিন্তু পরে অন্যান্য কৌতূহল মেটাতে গিয়ে প্রশ্নটা চাপা পড়ে যায়। আজ লিখতে বসার আগে নানা কুর্গ মেমেন্টোর মধ্যে তাঁর নাম লেখা ভিজিটিং কার্ডটা পেয়ে সেই মুহূর্তটা ফিরে এল।

গণেশদম্পতির পিছন পিছন একজন ট্রেতে সরবত নিয়ে হাজির হয়েছিল। গণেশ গিন্নি, 'কোকুম সরবত' বলে, খেতে ইঙ্গিত করলেন। একটা গ্লাস তুলে চুমুক দিতেই মন-প্রাণ জুড়িয়ে দিল সেই মালাবার তেঁতুলের স্বাদ। প্রায় সবাই টুকটাক কথার পিঠে কথা জুড়ে চলেছি, কিন্তু চোখ চলে যাচ্ছে গণেশগিন্নির দিকেই। ভদ্রমহিলা থামিয়ে দিয়ে বললেন, "যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে, আপনারা ফ্রেশ হয়ে খেতে চলে আসুন। খেতে খেতে গল্প করা যাবে।" একথা শুনেও আমরা মহিলা দুজন ভদ্রমহিলাকে নির্নিমেষ নয়নে দেখেই যাচ্ছিলাম। একে দীর্ঘাঙ্গী এবং দারুণ সুন্দরী তায় তাঁর শাড়ি পরার ধরন আমাদের যারপরনাই চমৎকৃত করেছে। বিশেষত আমি, এমন নির্লজ্জের মত দেখছিলাম যে তিনি বাধ্য হয়ে হেসে বললেন, "আমাদের শাড়ি পরার ধরন শিখিয়ে দেব তোমাদের দুজনকে।" শুনে সবাই হেসে উঠলাম। অগত্যা আমাদের দেখিয়ে দেওয়া ঘরের দিকে রওনা হতেই হল। বসার হল লাগোয়া ঘর, সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি নেই, কিন্তু আয়োজন যথেষ্ট আরামদায়ক। দুই দেওয়ালে মেঝে থেকে একহাত উপরে চারপাল্লার জানলা, বাইরে প্রচুর সবুজ দেখা যাচ্ছে। অন্য দেওয়ালে এক সদ্যবিবাহিত কোডাভা দম্পতির বাঁধানো বিরাট ছবি। সেটা দেখেই আমার ভাবনা যে পথে হাঁটা দিল তা এইরকম – কুর্গি বিয়ে... কুর্গি বিয়ের ভোজ, তারপরেই মন বলল কুর্গি খাওয়াদাওয়া অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। কথাটা মনে আসতেই ঝড়ের বেগে স্নান সেরে ছুটলাম খাওয়ার ঘরে। সেখানে দেখলাম ছ'জন বসার মতো খাওয়ার টেবিলের এক প্রান্তে আমাদের হোস্ট বসে, তাঁর স্ত্রী বাঁদিকের চেয়ারে এবং টেবিলে বিছানো নানা সুখাদ্য। ভদ্রলোকের আচরণ একেবারে গৃহস্বামীর মতো এবং আমরা তাঁর অতিথি। চব্বিশঘণ্টা এঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, একবারও এই অনুভবে আক্রান্ত হইনি যে যা পাচ্ছি অর্থের বিনিময়ে পাচ্ছি। বহু হোম স্টেতে থাকার অভিজ্ঞতা আছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, কিন্তু এই কুর্গি দম্পতির আতিথ্য শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা। হয়তো ভ্রমণের দেবতা আমাদের প্রতি, বিশেষ করে আমার

গণেশগিন্নি সযত্নে খাবার পরিবেশন করলেন পদগুলির পরিচয় দিতে দিতে। একই সঙ্গে কর্তাকেও দিলেন। তাঁর নিজের থালাও রাখা আছে সামনে, কিন্তু তখনই নিলেন না। গণেশমশাই "আসুন খেতে শুরু করি" বলামাত্র আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। খাবারের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। চালের তিনরকম খাবার ছিল। আক্কি ওট্টি - ভাতের মণ্ড থেকে তৈরি রুটি, নুলপুত্তু – চালের নুডলস এবং নেই কলু – এক ধরনের ঘিভাত। আক্কি রুটির সঙ্গে আমের এক অনাস্বাদিতপূর্ব পদ 'কাড মাঙ্গে' বা ওয়াইল্ড ম্যাঙ্গো কারি দিয়ে শ্রীমতি গণেশ বললেন, "এটা আমাদের প্রিয় জলখাবারও বটে।" আমের আচার জানি, চাটনি জানি, কিন্তু আমের যে কারি হতে পারে তা এই প্রত্যক্ষ করলাম! আমি তো ক্লিন বোল্ড, বেশ কয়েকটা খেয়ে নেওয়া যায় এই আম ও ভাত-রুটির যুগলবন্দী, কিন্তু অন্যান্য খাবারের কথা ভেবে একটাতেই থেমে গেলাম। এর পর এল আশ্চর্য খাবার নুলপুত্তু-র সঙ্গে মাছের আচার, বাঁশের কোঁড়ের একটি পদ আর কুট্টু কারি – নারকেল কোরা দিয়ে হরেক রকম আনাজের স্টু। অভিনব সব খাদ্য কুর্গি মশলা এবং রান্নার গুণে রসনার উৎসব লাগিয়ে দিয়েছিল। জানতাম যে কোডাভারা প্রবল আমিষাশী। কিন্তু দেখলাম তাদের নিরামিষ রান্নার বৈচিত্র্যও কম নয়। শেষ পর্বে এল পেঁয়াজ-রসুন ভাজা ও কাজুবাদাম দেওয়া ঘিভাত নেই কলু। তার সঙ্গে মরিচ মুর্গি পরিবেশন করতে করতে ভদ্রমহিলা বললেন রাতে খাওয়াবেন পান্ডি কারি। কুর্গিদের সবচেয়ে বিখ্যাত সিগনেচার ডিশ হল পান্ডি কারি। কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ নয়, আপাতত বর্তমানেই মুগ্ধ। খাঁটি মশলার তীব্র স্বাদ, পরিবেশনের মাধুর্য আমাদের বাকস্ফূর্তির সুযোগই দিচ্ছিল না। গোলমরিচের স্বাদ যে কী ঝাঁঝালোরকমের সুন্দর, প্রায় আমাদের জীবনের মত, কুর্গি পেপার চিকেনের টুকরোগুলো মুখে মিলিয়ে যেতে যেতে বুঝিয়ে ছাড়ছিল। একসময় ছোট দুটি কাচের গ্লাসে ভাঙা চালের পায়েস ও গুড় দিয়ে কফি রেখে গেল গৃহকর্ত্রীর সহযোগিনী। এই গুড় 'কাপি' কোডাভা ভোজের ফুলস্টপ বোঝায়। শেষ পর্বে পৌঁছে গেছি দেখে একটু ঢিমে তেতালায় খেতে খেতে গল্প শুরু করলাম। আমাদের ঘিভাত পরিবেশন করার পর গণেশগিন্নি নিজের পাতে খাবার নিলেন। ঠিক এই ছন্দেই তিনি খাবার দিতেন এবং খেতেন। তবে সবচেয়ে অবাক হলাম গৃহকর্তার খাওয়ার বহর দেখে। আমাদের সবার খিদে পেয়েছিল, সামনে অতি উপাদেয় খাবার ছিল, বয়সও ওঁর তুলনায় কম। কিন্তু এক একজন যা খেলাম তার চতুর্গুণ খেলেন ভদ্রলোক। আমাদের খাওয়ার দৌড় দেখে রীতিমত ঠাট্টা করলেন তিনি। অথচ গলা পর্যন্ত খেয়েছি আমরা!

জানলাম সব রান্নাই শ্রীমতী গণেশ করেছেন, তবে তাঁর তিনজন সহায়িকা আছে। গণেশদের দুই ছেলে, বাঙ্গালোরে কর্মরত । আমাদের ঘরে যে ছবি আছে তা তাঁদের বড় ছেলের বিয়ের ছবি। মানুষজন খুব ভালোবাসেন ওঁরা। ভদ্রমহিলাও কর্মহীন থাকতে পারেন না। তাই বছরপাঁচেক হল নিজেদের দুটি গেস্টরুমে হোম স্টের ব্যবস্থা করেছেন এবং দারুণ আনন্দে আছেন এইসব নিয়ে।

কর্তাগিন্নির খাওয়া শেষ হতে উঠে পড়লাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরোব ইরুপ্পু জলপ্রপাত দেখতে। যদি আলো থাকে, কাবেরী নদীতে রাফটিং করা যেতে পারে। কিন্তু ক্লান্তি এবং অতিভোজনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, চোখ খুলতে দেখি প্রায় চারটে। পুরুষ সদস্য দুজনের দেখি রাফটিং-এ প্রবল আগ্রহ জেগেছে। অতএব ইরুপ্পু বাতিল করে সোজা কাবেরীর তীরে যেতে হল। কিন্তু ততক্ষণে সাড়ে চারটে বাজবে বাজবে করছে। যারা গেছে তারা ফিরবে, নতুন করে আর জলে নামানো হবে না। আমি ও মিতালী অবাক হয়ে দেখলাম রাজীব ও কৌশিক বাচ্চাছেলের খেলনা চাওয়ার মত করে পিড়াপিড়ি করছে, আরেকটা রাফট নামান না, প্লিজ প্লিজ, যথেষ্ট আলো আছে। এই জলক্রীড়ার ব্যবসাটি যিনি চালান তিনি প্রবল কায়দার ইংরেজিতে ভারতীয়দের সময়জ্ঞান নিয়ে একটি প্যারাগ্রাফ শুনিয়ে দিলেন। তিনি নাকি দীর্ঘ পনেরো বছর আমেরিকায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারপর ভারতে এই কাজে নেমেছেন। সে দেশে সবাই বিপজ্জনক খেলার ক্ষেত্রে সময়ের মূল্য বোঝে। এই সব বলে তিনি ঝাঁপ বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি স্থান ত্যাগ করা মাত্র বঙ্গ সন্তান দুজন রাগে

নদিতি নামবেন? কাল সকালে আইয়া পড়লেই তো হয়।" আমরা চারজনই স্তম্ভিত। দেশের ওই প্রত্যন্ত কোণে উল্টে রাখা একটা কায়াকের উপর এক বাংলাভাষীকে দেখতে পেয়ে। এমন সিচুয়েশনাল কমেডির মুখোমুখি হইনি বহু দিন। মানুষটি কাজের খোঁজে ভেসে এসেছে ওইখানে।

আর সময় নষ্ট না করে গণেশের কফি ও মশলার বাগান দেখতে চলে এলাম। এতদিন ধূমায়িত ফিলটার কফি খেয়ে আহা বাহা করেছি, লাল টুকটুকে কফিবিনে ছেয়ে থাকা বেঁটে বেঁটে গাছগুলো দেখেও 'আহা'ই বেরোল মুখ থেকে। আর দেখলাম নানা ধরনের মশলা গাছ – এলাচ, জায়ফল, গোলমরিচ। বড় গাছের কাণ্ড ঘিরে উঠেছে গোলমরিচ গাছ। সবুজ গোলমরিচের দানা দেখে যারপরনাই চমৎকৃত হলাম।

সন্ধেবেলা কফির সঙ্গে মাটন বল খেতে খেতে গণেশ দম্পতির কাছে তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে নানা গল্প শুনছি যখন, মাথায় এল ছেলের বিয়ের সিডি আছে নিশ্চিত। ওঁদের ভাষ্যসহ তা দেখতে পেলে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হবে। প্রস্তাব করতেই ভদ্রলোক উল্লসিত হয়ে চালিয়ে দিলেন বড় ছেলের বিয়ের সিডি। ছেলেরা কুর্গি পরিধেয় 'কুপ্পা' পরে আছে যা ড্রেসিং গাউনের মত এক র্যা প অ্যারাউন্ড পোশাক। বরের কোমরবন্ধ লাল রঙের, অন্যান্যদের সাদা। একে 'চেলে' বলা হয় এবং এতেই একটি কুর্গি ছোরা গুঁজে রাখা থাকে। মেয়েদের শাড়ির কুঁচি পিছনে গোঁজা এবং আঁচল সারা শরীর বেড় দিয়ে ডান কাঁধে ব্রোচ দিয়ে আটকানো। প্রাচীন কালে নাকি এক বিশেষ ধরনের গিঁঠ দেওয়া হত, ব্রোচ বা পিন বর্তমান ব্যবস্থা। বিবাহিতা মেয়েরা 'চৌকন্না' বলে উজ্জ্বলরঙের ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে পিছনে বেঁধে রাখেন। প্রাত্যহিক জীবনে সবাই এই সব পোশাক না পরলেও অনুষ্ঠানের দিন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাবেকি পরিধেয়তেই সাজেন সবাই। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান হচ্ছে দুপক্ষের নির্বাচিত বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়কে সাক্ষী রেখে 'নেল্লাকি বলুচা'র সামনে শপথ নেওয়া। কিছু মজাদার প্রথা আছে। যেমন মেয়ের বাড়ি বরযাত্রী ঢোকার আগে বরকর্তা সামনে রাখা পাঁচটা বা সাতটা কলাগাছের কাণ্ড এক কোপে কেটে ফেলেন। তারপর হই হই করে সবাই প্রবেশ করে। শত্রুনিধন করে কন্যাকে জয় করে নেওয়ার দ্যোতক এই রীতি।

কোডাভারা নিজেদের বিরাট রাজার বংশোদ্ভূত মনে করে। স্কন্দ পুরাণমতে বিরাট রাজ্য বা মৎসদেশের চতুর্থ রাজপুত্র চন্দ্রবর্মা সৌভাগ্যের খোঁজে এই অঞ্চলে আসে। তারপর ব্রহ্মগিরি পর্বতে তপস্যা করে নতুন রাজ্য গড়ার বর পায় দেবী ভগবতীর কাছে। চন্দ্রবর্মার এগারোটি পুত্র হয়, তারা এই অঞ্চলে বসবাস করে ও বংশবৃদ্ধি করে। এদের উত্তরপুরুষরাই কোডাভা। ভগবতীর অবতার কাবেরী নদী রূপে প্রবাহিত হয়ে এই অঞ্চলকে শস্যশ্যামল করে তোলে। কাবেরী তাই কোডাভাদের কাছে দেবীরূপে পূজিতা এবং তুলাসংক্রান্তি তিথি তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র; কারণ সেই তিথিতেই কাবেরীর মর্তে আগমন ঘটেছিল। সেটি তাদের গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের দিন। এই কাহিনিটুকুই যা সংযোগ হিন্দুধর্মের সঙ্গে কুর্গিদের। তাদের জীবনের আচারঅনুষ্ঠানে কোনো বৈদিক প্রভাব নেই। বাড়িতে কোনো মূর্তির উপাসনা হয় না। তারা যে কাবেরীর পুজো করে সেও লৌকিক রীতিতে প্রকৃতি উপাসনা। কোডাভা জাতি আদতে পূর্বপুরুষপূজক। ধীরে ধীরে তাদের সংস্কৃতি নানা হিন্দু প্রভাব আত্মস্থ করলেও তাদের সামাজিক নিয়মে বা জীবনযাপনে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। জন্ম, মৃত্যু বা বিবাহ কোন অনুষ্ঠানেই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয় না। বিয়েতে ব্রাহ্মণ লাগে না, বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়রাই সেই কাজটা করেন। প্রতিটি কুর্গিবাড়িতে গোষ্ঠীর আদিপুরুষের আত্মার উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকে। সেখানে 'নেল্লাকি বলুচা' অর্থাৎ পবিত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সেই স্থানে প্রার্থনা করে যেকোনো শুভ কাজ করা হয়। গণেশ তাঁদের 'নেল্লাকি বলুচা' দেখালেন এবং আমরাও শ্রদ্ধা জানালাম।

কিন্তু দ্রাবিড়দের মাঝে এই পাহাড়ঘেরা জায়গায় কিছুসংখ্যক অ-দ্রাবিড় কি করে এল সে প্রশ্নে মন আলোড়িত হয়ে চলল।

নৈশভোজে প্রধান আকর্ষণ ছিল পান্ডি কারি ও কাডমবুত্তু। কাডমবুত্তু হল চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি গোল বল, যা পান্ডি কারির অনবদ্য জুড়িদার। পান্ডি অর্থ পর্ক। আগেকার দিনে বুনো শুয়োর শিকার করে কাচমপলি নামক কুর্গের নিজস্ব কালো ভিনিগারে দীর্ঘক্ষণ ভিজিয়ে রেখে রোস্টেড মশলায় রান্না হত। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। অমন নরম পর্ক সত্যিই আমি খাইনি কোথাও। এটা ওই ভিনিগারের গুণ। সকালের মতোই চালের তিনরকম অপশন ছিল। কাডমবুত্তু ছাড়াও আক্কি রুটি আর কুর্গি পোলাউ। সঙ্গে ছিল অভিনব স্বাদের হলুদ শসার তরকারি বোলারি বারথাড এবং একটি মাছের পদ। শেষপাতে মধু দেওয়া পুডিং। সত্যি বলতে কী পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহার করে খাওয়ার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। রাতে ঝরনার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। খুব ভোরে উঠে হাঁটতে বেরোলাম। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। চুপ করে থেকে সময়ের নির্যাসটুকু শুষে নিচ্ছিলাম অন্তরে। ফিরে এসে সারাদিনের মত তৈরি হয়ে নিয়ে প্রাতরাশ করতে গেলাম। আবারও নতুন একটা চালের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। পাপুত্তু – ভাঙা চাল, নারকেল ও দুধ দিয়ে তৈরি কেকের মতো খণ্ড। অবাক এবং মুগ্ধ হয়ে হয়ে ক্লান্ত আমি! আরও ছিল নীর ধোসা, ছিল আক্কি রুটিও, সঙ্গে দারুণ সাইডকিক এলু পাজি এবং আমার স্বপ্নে দেখা পেপার ক্যাপসিকাম স্ট্যর ফ্রায়েড ইন বাটার। একমাত্র গুড় কফি ছাড়া প্রতিটি খাবার আমার রসনাকে সাত তারা পরিতৃপ্তি দিয়েছিল।

গণেশদম্পতির কাছে বিদায় নিতে গিয়ে মন ভারি হয়ে উঠল। গাড়িতে যাচ্ছি যখন ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়, শ্যামল অরণ্য আর খেতখামার ঘিরে সহস্রাধিক বছর ধরে কিছু মানুষের যে আনন্দিত বসবাস তার এক বিশ্বস্ত ছবি আঁকা হচ্ছিল মনের ভিতর।

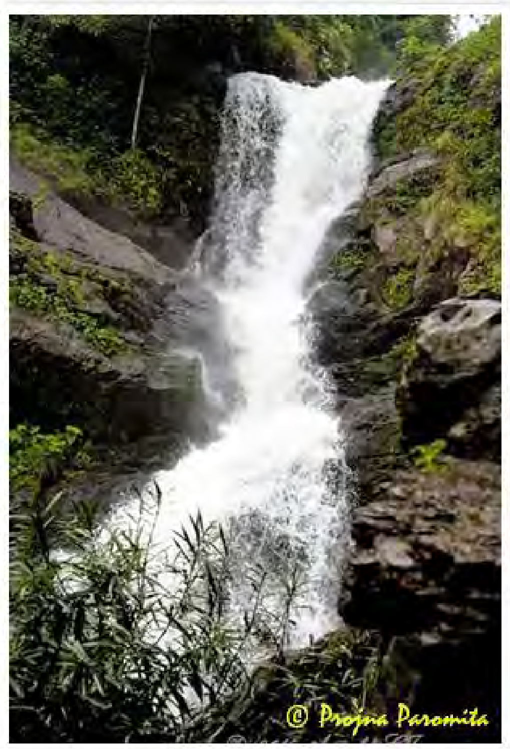

ইরুপ্পু জলপ্রপাত দারুণ সুন্দর, কিছুটা বনপথে হেঁটে পৌঁছতে হয়। লক্ষ্মণতীর্থ নদী তিন ধাপে এই প্রপাত সৃষ্টি করেছে। এদেশের প্রতিটি রাজ্যই রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে সংযোগসূত্র দাবি করে। আর্যায়ণে নিহিত এই আকাঙ্ক্ষার বীজ। এখানে এসে আবার সেই প্রমাণ পেলাম। কথিত যে রাম ও লক্ষ্মণ নাকি সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে এই অঞ্চলে হাজির হয়েছিলেন। রাম তৃষ্ণার্ত হলে জলের অভাবে লক্ষ্মণ শরনিক্ষেপ করে এক জলস্রোত সৃষ্টি করেন। সেই স্রোতই লক্ষ্মণতীর্থ নদী রূপে প্রবাহিত। জলের শব্দ আমাদের সব কথা থামিয়ে দিয়েছিল, মুগ্ধদৃষ্টি দিয়েই তাকে ছুঁলাম। অনেকক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করলেও সেখান থেকে রওনা দিলাম থলকাবেরী।

অসংখ্য এলাচ খেত, কফি খেত পেরিয়ে গেলাম, পেরোলাম গভীর অরণ্য, উচ্চাবচ উপত্যকা। তারপর পৌঁছলাম ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের সেই পবিত্র কুণ্ডে, যেখান থেকে কাবেরীর উৎপত্তি। কুণ্ড ঘিরে শ্বেতপাথরের সুবিশাল মন্দিরচত্বর। কুণ্ডের প্রাকৃতিক রূপ কল্পনায় আনার চেষ্টা করে বিফল হলাম। কাবেরীর পৌরাণিক জন্ম-কথা স্মরণ করলাম - কাবেরীর মানুষী সত্ত্বা ব্রহ্মবাদিনী লোপামুদ্রাকে যার লেখা ঋগ্বেদের রতিসূক্ত। পরমাসুন্দরী লোপামুদ্রা কুরূপ এবং বৃদ্ধ স্বামী অগস্ত্যকে মেনে নিয়েছিল, কিন্তু মানতে পারছে না তাঁর ঔদাসীন্য। তার সেই সময়ের মনের ছবি ধরা আছে রতিসূক্তে। বহু সহস্র বছর আগেকার এক দম্পতির আরণ্যক আশ্রম-জীবনের ছবি ঘিরে ধরল আমায়। থল কাবেরী ছেড়ে যখন অ্যাবে ফলসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তখনও কাবেরীর ভাবনা ছাড়ল না। কাবেরীর এক উপনদী সৃষ্টি করেছে এই জলপ্রপাত। মনোরম কফি বাগানের মধ্যে দিয়ে পৌঁছতে হয়। অবিরাম জলের ধারা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল আচ্ছা, লোপামুদ্রার কাবেরী হয়ে বয়ে যাওয়া কি আসলে সংসারত্যাগের রূপক?!

বিকেলে মাদিকেরি শহরে ঢুকে প্রথমেই চলে এলাম রাজা'স সিট। এখানে বসে রাজা সূর্যাস্ত দেখতেন। উপত্যকার অপূর্ব

পরিশিষ্ট: মাদিকেরি থেকে হ্যান্ডমেড চকলেট, ইউক্যালিপটাস অয়েল আর অরিজিন অফ কোডাভা নামে একটি বই কিনেছিলাম। প্ল্যানটার'স ওয়াইফ পরিচালিত একটি কফিপাবে ফিল্টার কফি খেতে গিয়ে ম্যানেজার মেয়েদের জন্য বাড়িতে তৈরি নানারকম ওয়াইন আমাদের চেখে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। চামচে করে টেস্ট করে বোঝদারের মত ভঙ্গি করে গেছিলাম। তবে সবচেয়ে মজা পেয়েছিলাম পানের ফ্লেভারের ওয়াইন চেখে। ঠিক যেন আমার দিদার ছাঁচি পানের আমেজ রসনায় ছড়িয়ে গেল। বলা হয়নি যে কথাটা, সুরা কোডাভাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মহিলাদের জন্য বাড়িতেই তৈরি হয় আলাদা রেঞ্জের সুরা।

প্রজ্ঞা পারমিতা ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস লিখছেন বছরদশেক। মেডিক্যাল জার্নালিজম করেছেন 'বর্তমান' প্রকাশনার স্বাস্থ্য পত্রিকাতে। 'মাতৃশক্তি' ও 'জাগ্রত বিবেক' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যরক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে কলম ব্যবহার করে থাকেন।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বাঘের খোঁজে টাডোবায়

শুভেন্দু রায়

দূর দূর... এ যাত্রাও হল না... বান্ধবগড় থেকে ড্রাইভ করে ফিরতে ফিরতে এটাই ঘুরে ফিরে মনে আসছিল... লোকমুখে শোনা যে কোথাও না দেখতে পেলে বান্ধবগড়-এ বাঘের দেখা মিলবেই...

বহুদিনের ইচ্ছে খোলা জঙ্গলে বনের রাজাকে দেখার। সেই ইচ্ছে নিয়ে বারবার ছুটে গিয়েছি বিভিন্ন টাইগার রিজার্ভে, কিন্তু তাঁর দেখা মেলেনি। নয় নয় করেও সাফারি করেছি বেশ কয়েকটিই রিজার্ভ ফরেস্টে, যেমন মধ্যপ্রদেশের পান্না ন্যাশনাল পার্ক, কানহা টাইগার রিজার্ভ, বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভ, মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ, নাগজীরা টাইগার রিজার্ভ, সুদূর আসাম এর কাজিরাঙা এবং মানস ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি, এমনকি সুন্দরবনেও দেখা মেলেনি বাঘের। শুধু লোকমুখে শুনে আর ইউটিউবে ভিডিও দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই। আমরা মানে আমি, আমার স্ত্রী, ভায়রাভাই সন্তোষদা ও তার স্ত্রী। অনেক ভেবে তাই টাডোবাকে পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে স্থির করা হল।

টাডোবার কথা আমি প্রথম শুনি জনৈক মারাঠি ভদ্রলোকের কাছে। প্রথমবার পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভে সাফারি করতে গিয়ে বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। সাফারির জন্য যে আগে থেকে বুকিং করতে হয় তা জানা ছিল না, সাফারি বুকিং না করেই পৌঁছে গিয়েছিলাম পেঞ্চ-এর মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের রিসর্টে। ওখানকার ম্যানেজার ভদ্রলোকের কাছে কথায় কথায় জানতে পারলাম যে সাফারি আগে থেকে বুক করে রাখতে হয় নচেৎ জঙ্গলে ঢোকার সুযোগ পাওয়া সাধারণত মুশকিল, কারণ সাফারির সংখ্যা সীমিত এবং প্রায় সবকটাই আগে থেকে ইন্টারনেটে বুক হয়ে যায়। আজকাল অবশ্য এই ব্যবস্থা বেশিরভাগ ন্যাশনাল পার্কেই চালু হয়েছে, যা সবার পক্ষেই ভালো। যাই হোক, এই মারাঠি ভদ্রলোকটি উদয় হলেন আমার

গেল। কিন্তু প্রায় ঘন্টাচারেকের সাফারিতে বাঘের দেখা পাওয়া গেল না। তখন ওই ভদ্রলোক জানান যে ওঁরা টাডোবা থেকে আসছেন এবং ওখানে ভালোভাবে বাঘ দেখতে পেয়েছিলেন।

তাই এবার প্ল্যান করলাম যে নেক্সট সুযোগে আর কোথাও না - সোজা টাডোবা।

টাডোবা টাইগার রিজার্ভটির পুরো নাম হল টাডোবা আন্ধারি টাইগার রিজার্ভ বা টি এ.টি.আর.। আমরা ছত্তিসগড়-এর দুর্গের বাসিন্দা। এখান থেকে টাডোবার দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিলোমিটার, অনেক পরিকল্পনা করে করে শেষে ঠিক হল পুজোর সময়টায় যাওয়ার। কলকাতা থেকে মাসি মেসো এসে যোগ দেওয়াতে প্রোগাম আরও জমে উঠল।

এক রবিবারের সকালে বেরিয়ে পড়লাম টাডোবার উদ্দেশে। দুর্গ থেকে টাডোবা যেতে হলে কলকাতা - মুম্বাই হাইওয়ে ধরে প্রায় ১৬০ কি.মি. যাওয়ার পর হাইওয়ে ছেড়ে অন্য পথ ধরতে হয়। প্রায় ১০০ কি.মি. যাওয়ার পর চোখে পড়ল হাইওয়ে চৌপাটি নামে একটি সুন্দর ধাবা। দাঁড়িয়ে পড়লাম লাঞ্চের জন্য। ধাবাটি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বিশেষ করে বাথরুম। এখানে লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে যখন টাডোবার রিসর্টে পৌঁছোলাম বেলা গড়িয়ে এসেছে, প্রায় চারটে বাজে। সেদিন আর বিশেষ কিছু না করে রিসর্টে বিশ্রাম করলাম।

সকালের সাফারি বুক করেছিলাম টাডোবার মোহারলি গেটে। পরেরদিন সকাল পাঁচটায় উঠে তৈরি হয়ে ঠিক ছটার ভেতর ঢুকে পড়ি অভয়ারণ্যে। প্রথম ঘন্টা খানেক মনে হচ্ছিল যে এখানে আসাও বৃথা হল, জানোয়ার খুব একটা চোখেই পড়ছিল না। এমনকী হরিণও না যা সচরাচর অনেক দেখা যায়। ঘন্টাদেড়েক পর বেলা বাড়াতে আস্তে আস্তে দেখা মিলল তৃণভোজীদের। তারপর দেখা পেলাম তার যার জন্য এতো প্রচেষ্টা – একটা মোড় ঘুরতেই সামনে দেখা গেলো বাঘটিকে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জীপের রাস্তা ধরে। দু-একবার নিরাসক্তভাবে ফিরে তাকাল পিছনে থাকা গাড়িগুলোর দিকে

আবার এগিয়ে চলল নিজের পথে গজেন্দ্র গমনে। যার প্রতিটি পদক্ষেপ বলতে চাইছে, এটা আমার এলাকা... দেখতে এসেছ... দেখ... তারপর ফিরে যাও।

যাঁরা সাফারিতে বাঘ দেখেছেন জানেন যে প্রথমবার খোলা জঙ্গলে বাঘ দেখা একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বিশেষত যাঁরা ওয়াইল্ডলাইফ ভালোবাসেন। যা কথায় বলে বোঝানো বোধহয় পুরোপুরি সম্ভব নয়। প্রায় মিনিটদশেক পর বাঘটি ধীরেধীরে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। মাঝে মাঝে তার গর্জন শোনা যাচ্ছিল। গাইড জানাল দুটি বাঘকে কিছুদিন ধরে একসঙ্গে ওই অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে এবং সম্ভবত এরা দুই ভাই এবং এখনও নিজের এলাকা ভাগ করে নেয়নি। অন্যটি বোধহয় আশেপাশে কোথাও আছে। যেটিকে দেখলাম এটিও আকারে বেশ বড় এবং পূর্ণবয়স্ক বলে মনে হল। এরপর আরও ঘন্টা খানেক জঙ্গলে ঘুরে ফিরে এলাম রিসর্টে। অন্যান্য জানোয়ার অনেক দেখা গেলেও বাঘ আর দেখা গেল না।

টাডোবার জঙ্গলের মাঝে বয়ে গিয়েছে দুটি নদী, আন্ধারি নদী পূর্ব দিকে এবং এরাই নদী জঙ্গলের পশ্চিম ভাগ ধরে। এই আন্ধারি নদী নিয়েই টাডোবা আন্ধারি ব্যাঘ্র প্রকল্প।

টাডোবাতে চোখে পড়েছিল স্পটেড ডিয়ার বা চিতল, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার, চৌশিঙ্গা ও নীলগাই। মাঝে মাঝে ইতস্তত ঘাস খেতে থাকা গাউর-এর দল। গাউরকে অনেকেই বাইসন বলে ভুল করেন, দুটি আলাদা প্রজাতি। ভাগ্য ভালো থাকলে চোখে পড়তে পারে ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগ বা 'ঢোল' এর দল। ভালুক বা লেপার্ড সচরাচর চোখে পড়ে না। দেখা পেলাম বেশ কিছু চেনা-অচেনা পাখির। জঙ্গলে রয়েছে অর্জুন, মহুয়া, তেন্দু ও বাঁশ গাছ। সাফারির সময় ক্যামেরা নেওয়া বারণ এবং মোবাইল ফোনেও ছবি তুলতে দেওয়া হয় না। জঙ্গলে ঢোকার সময় দূরবীন নেওয়া একটি ভালো বিকল্প বিশেষত পাখি দেখার জন্য।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে কৃষিবিজ্ঞানে ডক্টরেট শুভেন্দু রায় বর্তমানে দুর্গ-ছত্তিশগড়ে একটি বেসরকারি এগ্রিকালচার কলেজের অধ্যক্ষ। বন্যপ্রাণী এবং জঙ্গল তাঁর নেশা। ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে দেশের বিভিন্নপ্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং এখনও বেড়ান। সময় পেলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে অল্পবিস্তর লেখালেখি করেন। shubhendu_roy@yahoo.co.in এই ই-মেইল-এ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment Add Image

Not using Html Comment Box yet?

No one has commented yet. Be the first!

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011-19 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়া – সাতান্ন বছর পরে আবার

তপন পাল

প্রস্তাবনা

অবসরের পর হঠাৎ একটু বিদেশভ্রমণের সখ হল। বিদেশভ্রমণ মানে একদম সত্যিকারের বিদেশভ্রমণ, বেশ এক্সোটিক ব্যাপারস্যাপার হবে, হাপ পেন্টুল আর রঙচঙে জামা পরে ক্যামেরা হাতে ঘুরে বেড়াব – এমনটি আর কী! বাংলাদেশ নেপাল ভুটান বিদেশ বলে মনে হয় না, আর আমার তো আজকাল ব্যাংকক সিঙ্গাপুর কি দুবাইকেও বিদেশ বলে মনে হয় না। চিত্রতারকা ধর্মেন্দ্র একবার বলেছিলেন তিনি লন্ডন খুব ভালোবাসেন কারণ লন্ডন একদম লুধিয়ানার মত। লুধিয়ানা মনে না হলেও, ব্যাংককেকে প্রায়শই আমার রামপুরহাট বা জলপাইগুড়ি বলে ভুল হয়। আর ইতিহাস আমাকে যে দেশগুলিতে টানে, মায়ানমার বা সমরকন্দ বুখারার উজবেকিস্তান; সেখানে যাওয়ার বড় হ্যাপা। বেড়াতে গিয়ে কষ্ট করা আমার বিলকুল না-পসন্দ। বেড়াতে গিয়ে যদি একটু টানটান হয়ে ঘুমানো না গেল, দুটি দীর্ঘায়িত হাই না তোলা গেল, তবে এত পয়সা খরচ করে বেড়াতে যাওয়া কেন!

যখন সরকারি চাকরি করতাম, দীর্ঘকাল থাকার সুবাদে কোনও কোনও জেলার সঙ্গে নিবিড় সখ্য হত। তারপর বদলির চিঠি পেলেই বেরিয়ে পড়তাম সেই জেলার আমার প্রিয় জায়গাগুলো আর একবার, শেষবারের মত, দেখে নিতে; কারণ জানি তো মুখে যতই বলি, 'বারে বারে আর আসা হবে না' – এলেও আসা হবে জেলাশহর অবধি, জেলার নিভৃতে পৌঁছানো হবে না। মুর্শিদাবাদ ছেড়েছি ১৯৯২-তে – তারপর একবারও কি গিয়ে উঠতে পেরেছি আমার প্রিয় দোহালিয়া কালীবাড়িতে, বা ভট্টবাটিতে, বা আমাইপাড়ায়! বয়স বাড়লে মৃত্যুচিন্তা লোকসঙ্গীতের ধুয়ার মত ফিরে ফিরে আসে। মৃত্যুর আগে হাতিরা নাকি দল ছেড়ে চলে যায় গভীর অরণ্যে, প্রতীক্ষায়। আমারও তেমনি সখ হল ছোটবেলার চেনা জায়গাগুলিকে আর একবার দেখে নিতে।

আমার শৈশব কেটেছে শ্যামনগরে ও বাটানগরে; তবে তার মধ্যে কিছুকাল (১৯৬২ – ১৯৬৪) ভিয়েতনামে। আমার বাউন্ডুলে বাবা চাকরি করতেন এ.জি.বেঙ্গলে। সেখান থেকে ডেপুটেশন নিয়ে ১৯৬১-তে তিনি চাকরি করতে যান ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল কমিশন-এ। কমিশনের সদরদপ্তর ছিল তদানীন্তন দক্ষিণ ভিয়েতনামের সায়গনে, কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল লাওস, কম্বোডিয়া ও তখনকার উত্তর ভিয়েতনামেও। সদ্যযুবক বাবা যাওয়ার সময় আমার কিশোরী মাকে বলেছিলেন এক বছর পরে আসবেন; কিন্তু কোথায় কী! অগত্যা আমার স্বল্পশিক্ষিতা মা তিন বছরের আমাকে নিয়ে দমদম থেকে একদিন চেপে বসলেন প্যান এমের বোয়িং ৭০৭-এ; ব্যাংককে একবার থেমেই তিনি আমাদের নামিয়ে দেবেন সায়গনে। এই অবধি পড়ে যারা ভাবছেন যে ষাটের দশকে দমদম বিমানবন্দরের সোনার দিন ছিল, আন্তর্জাতিক বিমানসংস্থাগুলির উড়োজাহাজ হরদম নামত উঠত, তাদের অবগতির জন্য বলি, সরু ও মাঝারি আকারের দূরপাল্লার চার ইঞ্জিনের বোয়িং ৭০৭ (উচ্চারণ সেভেন ওহ সেভেন)-এর ব্যাপ্তিসীমা ছিল মোটে ৫৭৫০ নটিক্যাল মাইল। প্রতিতুলনায় আজকের বোয়িং ৭৭৭-২০০ এলআর-এর ব্যাপ্তিসীমা ৯৩৯৫ নটিক্যাল মাইল,এয়ারবাস এ-৩৮০ এর ব্যাপ্তিসীমা ৮৪৭৭ নটিক্যাল মাইল। সেই সময় তাই ইউরোপ থেকে ইন্দোচিন বা অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার বা ফেরার পথে সব উড়োজাহাজকেই দমদমে নামতে হত। যাত্রাপথে এদের এখন আর দমদমে তেল ভরতে নামার দরকার পড়ে না; দমদমে তাই ভিড় কমেছে।

তা সায়গনে পৌঁছানো গেল, বাবাকে বেশি খুঁজতে হল না, তিনি তাঁর কূটনৈতিক পরিচয়পত্রের সুবাদে উড়োজাহাজের

ওপর দিয়ে বয়ে যায় দ্রুত,নিচে ফেলে রেখে তার মলিন ছায়া। এতগুলো বছর পেরিয়ে আংকরভাট দেখার ইচ্ছেটা চেগে উঠল।

পুত্র শুনেই বললেন, কোন চিন্তা নেই। আংকরের কাছের বিমানবন্দর – সিয়েম রিপ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (Siem Reap International Airport – IATA: REP, ICAO: VDSR)। কলকাতা থেকে সরাসরি উড়ান নেই, মধ্যিখানে একবার শুধু নামতে হবে, তা তুমি কোথায় নামবে বলো – কুয়ালালামপুর না ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর না হংকং। আংকর সেখান থেকে ছয় কিলোমিটার, কিসে যাবে বল, গাড়িতে না হেলিকপ্টারে? আমি অতটা দুঃসাহসী হতে সাহস পেলাম না। বাবা ফরাসি, ভিয়েতনামি (tiếng Việt) ও কিমায়র (Khmer) জানতেন, মা ফরাসি জানেন; কিন্তু আমি ইংরিজিটাও ভালোভাবে বলতে পারি না। এই ভাষাজ্ঞান নিয়ে বিদেশবিভূঁইয়ে একলা যেতে সাহস পেলাম না; সঙ্গে দুটো দেশের ভিসা, মুদ্রা বিনিময়ের ঝঞ্ঝাট, তাই ভ্রমণসংস্থার সঙ্গে যাওয়া ঠিক হল। পুত্রবধূ বললেন, কোনও স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যাও – বাঙালি ম্যানেজার বাঙালি খাওয়ার লোভে হুট করে যেও না - তাতে অন্তত যে হোটেলে উঠবে সেখানে ফায়ার অ্যালার্ম থাকবে, রাতবিরেতে শরীর খারাপ করলে ডাক্তার জুটবে, বাসি ডাল খেয়ে পেট ছাড়বে না। খুল্লতাত মহোদয় বলিলেন, ট্রাভেল এজেন্টদের তিনটি সংগঠন আছে, বুক করার আগে জেনে নিস যে ভ্রমণসংস্থাটি ওই তিনটির কোনও একটির সদস্য কি না।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে একটি পর্যটন মেলা হচ্ছিল; সেখানে গেলাম। উপরোক্ত প্রশ্নগুলি করাতে অনেক স্টলের দাদাদিদিরাই অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অনেক খুঁজে পেতে একটি ভ্রমণসংস্থায় বুক করলাম। দশ দিন, ভ্রমণনির্ঘণ্টে কলকাতা থেকে হ্যানয়, সেখানে তিনদিন কাটিয়ে আংকর, তিনদিন পর এখনকার হো চি মিন সিটি অর্থাৎ সাবেকি সায়গন; আমার শৈশবের বৃন্দাবন। সেখানে তিন দিন কাটিয়ে বাড়ি।

যাত্রাপথের আনন্দগান

কলকাতা-হ্যানয় সরাসরি উড়ান চালু করেছে ইন্ডিগো। বিরতিহীন দুঘণ্টার সেই উড়ানে গেলে অনেকখানি সময় বাঁচত। কিন্তু ভ্রমণসংস্থার যাত্রীদলটি সর্বভারতীয়, কিয়দংশে বহুজাতিক। তাই আমাদের যাত্রাপথটি ঢেঁশকেল দিয়ে কটক গোত্রের। কলকাতা থেকে বিকাল সাড়ে ছটায় ইন্ডিগো ৬ই ৫৩৪ ধরে চেন্নাই। যাত্রীদলের ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে সেখান থেকে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের এমএইচ-১৮১ রাত বারোটা কুড়িতে; কুয়ালালামপুর স্থানীয় সময় সকাল ছটা পঞ্চাশে। সেখান থেকে আরও কিছু সদস্যকে নিয়ে সকাল নটা চল্লিশের এমএইচ-৭৫২; হ্যানয় পৌঁছনো স্থানীয় সময় বেলা বারোটায়। আশা ছিল আন্তর্জাতিক উড়ানে একটু ভালো উড়োজাহাজে চড়বো; বোয়িং ৭৭৭ বা ৭৮৭ বা এয়ারবাস ৩৩০; একটু ভালো এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যাবো থাই বা সিঙ্গাপুর বা ক্যাথে; কিন্তু কোথায় কি! কলকাতা-চেন্নাই সেই অনিবার্য এয়ারবাস ৩২০; শ্রীমতী পালের ভাষায় সাতাত্তর রুটের বাস। আর চেন্নাই-কুয়ালালামপুর আটপৌরে বোয়িং ৭৩৭ – লোকে যাতে চড়ে রাঁচি যায়। সূচিটি পেয়েই ভ্রমণসংস্থাটিকে বললাম আপনাদের সঙ্গে আমার এই শেষ যাওয়া। সামনের বছর ইসরায়েল জর্ডানের জন্য একটা ভ্রমণসংস্থা দেখছি এখন থেকেই খুঁজতে হবে। তারা তারস্বরে দুঃখপ্রকাশ করে বলতে লাগলেন বড়দিন নববর্ষের মরশুমে কোনো উড়ানেই নাকি টিকিট নেই। বিশ্বাস করলাম না।

ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখে অপরাহ্নে অতএব দুর্গা দুর্গা দমদম। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক, যখন কেউ বলে ঈশ্বর নেই, আমার ভারি রাগ হয়। ঈশ্বর বলে কেউ না থাকলে বিগত ষাট বছর ধরে প্রতি পদে আমার জীবন দুর্বিষহ করছেন কে! এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না – আমাদের উড়োজাহাজ VT-IHN চেন্নাই নামলেন আটটা চল্লিশের পরিবর্তে এগারোটা পঞ্চাশে। কলকাতায় পারদ সেদিন তেরোয়,গায়ে বিস্তর শীতবস্ত্র – চেন্নাইয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। আন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিকে দুটো ব্যাগ টানতে টানতে আমি ঘর্মস্নাত। গিয়ে শোনা গেল মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, এম.এইচ.-১৮১ এই উড়ল বলে।

ভ্রমণ সংস্থাটিকে ফোন করলাম। তারা বললেন ভাববেন না। কোনো হোটেলে উঠে আরাম করুন, পয়সা আমরা দিয়ে দেব। দুপুর এগারটা পঁয়তাল্লিশের মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের এম.এইচ.-১৮৩ তে বুক করে দিচ্ছি, চারটেয় কুয়ালালামপুর। তারপর যা হোক একটা ব্যবস্থা তো হবে, আপনার হ্যানয় যাওয়া কে আটকায়! রাজি হলাম না। পয়লা জানুয়ারি সকাল আটটা থেকেই নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ভ্রমণ শুরু; আমি তার এক পলও হারাতে রাজি নই। বললাম আমার ফুল সার্ভিস উড়ানসংস্থার দরকার নেই, আপনি আমাকে ইন্ডিগো কেটে দিন। তা তারা দিলেন। তদনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বেরোতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীর মুখোমুখি। য়্যহ নির্গমন লাউঞ্জ হ্যায়, নিকলনা আলাওড নেহি। তাকে কে বোঝায় যে আমাদের উড়োজাহাজ ছেড়ে গেছে! বৃথা চেষ্টা। খুঁজেপেতে এক হোমরাকে ধরলাম, বললাম, টিকিট দেখালাম। তিনি বললেন যে বিমানসংস্থার টিকিট তাদের লোককে নিরাপত্তা বাহিনীর খাতায় লিখে দিতে হবে। কিন্তু চেন্নাইতে তো মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসই নেই। তিনি খোঁজ নিলেন চেন্নাইতে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের হ্যান্ডলিং এজেন্ট কে, তাদের লোককে তিনিই ডাকলেন,তারা মিলিয়ে দেখে নিশ্চিত হলেন যে আমাদের টিকিটের বোর্ডিং পাস ইস্যু হয়নি; তারপর খাতায় টিকিট নম্বর থেকে পাসপোর্ট নম্বর সব লিখেটিখে আমরা বাইরে এলাম।

তখনো বৃষ্টি অব্যাহত। রাতটা চেন্নাই বিমানবন্দরে কাটিয়ে সকাল সাড়ে পাঁচটার উড়ানে ফের কলকাতা; ৬ই-৯৮৭, VT-

কম। যাত্রীদের মধ্যে বিদেশি বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদেরই প্রাধান্য। তারা অনেকেই অনেক অনেক দূর থেকে অমিতাভ তথাগতের দেশ দেখতে এসেছিলেন। ভারতে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা আসেন জানতাম, বস্তুত গয়া-বারাণসী, গয়া-ব্যাংকক, গয়া-পারো, গয়া-ইয়াঙ্গন, কলকাতা-ইয়াঙ্গন, গয়া-কলম্বো, বারাণসী-ব্যাংকক, বারাণসী-কলম্বো, বারাণসী-কাঠমান্ডু প্রভৃতি উড়ানগুলি এঁদের জন্যেই টিঁকে আছে। জানালার পাশের আসনে শ্রীমতী পাল, মাঝের আসনে আমি,আমার পাশের আসনে এক কোরিয়ান যুবক। এত স্বল্পবয়সে তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন দেখে আমি তো অবাক। তিনি আমাকে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির গল্প শোনাতে লাগলেন,বললেন তোমার তো ভারি মজা, ইচ্ছে হলেই সেখানে যেতে পারো। শুনে আমার 'হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি' অবস্থা। কলুটোলা স্ট্রিটের নাম বদলে অনাগরিক ধম্মপালা স্ট্রিট হয়েছে জানি,১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনিই সংগঠনটির মূল কার্যালয় কলম্বো থেকে স্থানান্তরিত করে কলকাতায় এনেছিলেন তাও জানি। বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের হৃতঅধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থে তার উদ্যমের কথাও শুনেছি। কিন্তু লজ্জার কথা যে খুব ছোটবেলায় আমার নাস্তিক বাবার হাত ধরে একবার যাওয়া ব্যতিরেকে ন্যূণাধিক বারো বছর কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে কাটানো সত্ত্বেও একদিনের তরেও সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

আমাদের জমিয়ে গ্যাঁজাতে দেখে আসনশ্রেণির মধ্যবর্তী পথের (aisle) ওপার থেকে কোরিয়ান যুবকটির সহতীর্থযাত্রী ভিয়েতনামি প্রৌঢ়টি উসখুস করছিলেন; বোঝা যাচ্ছিল গ্যাঁজানোয় যোগ দিতে না পেরে তার পেট ফুলছে। সহৃদয়া বিমানসখিকে বলে ব্যবস্থা হল, শ্রীমতী পাল তাঁর আসনে গিয়ে বসলেন, তিনি এপারে এলেন। আমার শৈশবের কিছুকাল ভিয়েতনামে কেটেছে শুনে তিনি তো অবাক। তখনকার গল্প শুনতে চাইলেন। সে কি ছাই মনে আছে, তবু বললাম বিকেলবেলায় মার সঙ্গে ত্রাং বোনেদের মূর্তি চত্বরে বেড়াতে যেতাম। মা খুচখাচ কেনাকাটা করতেন; ততদিনে মা কাজ চালানো ফরাসি শিখে ফেলেছেন। শুনে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন; তুমি ত্রাং বোনেদের কথা জানো!

তখনকার সায়গন শহরে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকা খুব উঁচু ত্রাং বোনেদের মূর্তি ছিল। ত্রাং বোনেরা ছিলেন ভিয়েতনামের জাতীয় বীর। দুহাজার বছর আগে চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনযুদ্ধে তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদের প্রতীক এমন সুন্দর ভাস্কর্যটিকে ১৯৬৩-র নভেম্বরের অভ্যুত্থানে (তখন আমরা ভিয়েতনামে) ভেঙে দেওয়া হয়। কারণটি ছিল হাস্যকর; মূর্তিটিতে দুই বোনের মুখের সঙ্গে নাকি ভিয়েতনামের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি গো দিন দিয়েমের ভ্রাতৃবধূ মাদাম গো দিন হু-র মুখের মিল ছিল। রাষ্ট্রপতি গো দিন দিয়েম ছিলেন অকৃতদার, তাঁর ভ্রাতৃবধূ মাদাম গো দিন হু ছিলেন ফার্স্ট লেডি। শুধু এই অপরাধে খ্রিস্টের সমসাময়িক এই দুই বোনকে মুখ থুবড়ে পড়তে হল। ওই বয়সেও খুব খারাপ লেগেছিল। আমার মা তো দস্তুরমত মর্মাহত হয়েছিলেন।

হ্যানয়ে নেমে ভিয়েতনামি প্রৌঢ়টি বললেন, কিছু মনে কর না, আমি একটু বেশি বকি, যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি তো! এবারে আমার জড়িয়ে ধরার পালা। ভাইরে, কী শোনালি! আমার দিদিমার সংসারে দুবেলায় ষাটটা পাত পড়ত মনুষ্যের, তার বাইরে গরু, ছাগল, খরগোশ, হাঁস, মুরগি, টিয়াপাখি, পায়রা...। সে কথা বলতেই তিনি বললেন তাই নাকি? জানো তো আমিও দিদিমার বাড়িতে মানুষ। আমার বাবা জোতদার - প্রায় জমিদার বাড়ির ছেলে, কিন্তু বাড়ির অমতে আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন বলে আমার ঠাকুরদাদা বাবাকে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছিলেন। তা দাদা এসোনা আমার বাড়িতে একদিন, দুভাইয়ে একসঙ্গে বসে চাট্টি ভাত খাব!

অভিবাসনে সামরিক উর্দি - জলপাই রঙের পেন্তুল ও স্তালিনিয় কোট, সাদা জামা টাই পরা লোকজন। কলকাতা থেকে ফর্ম লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম, কয়েকটি কলাম খালি ছিল, জিজ্ঞাসা করে লিখব বলে; স্বাক্ষরও করিনি – তা সে সব ফাঁকাই রইল; ব্যাগপত্তরও কেউ খুলে দেখল না। সবটাই বেশ 'আরে বাপ্পা এসেছিস! বাঃ বাঃ! দে পঞ্চাশ ডলার দে, এই নে ভিসা, যা আনন্দ কর' গোছের ব্যাপার। এবার মুদ্রা বদল। এক ডলারের বিনিময়ে সেদিন ভিয়েতনামি ডং পাওয়া যাচ্ছিলো ২৩০৯৫। দুশো ডলার দিয়ে ৪৬,১৯,০০০ ভিয়েতনামি ডং নিয়ে বিজয়গর্বে বাইরে। সদাশয় হোটেল কর্তৃপক্ষ (KURATAKE INN THO NHUOM 84) গাড়ি পাঠিয়েছিলেন। গাড়িতে অনেকখানি রাস্তা; এবং রাস্তা সেতু দেখে আমি চমৎকৃত। একটা জাত মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরে (১৯৭৫ – ২০২০) এতখানি এগোল! সাতান্ন বছর আগে, যখন আমরা এখানে থাকতাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম (Việt Nam Cộng hòa) ও উত্তর ভিয়েতনাম (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) ছিল দুটো আলাদা রাষ্ট্র। দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেই হলুদের উপরে আনুভূমিক তিনটি লাল সরলরেখার পতাকাও আজ ইতিহাস। দক্ষিণের রাজধানী ছিল সায়গন, আমরা সেখানেই থাকতাম। উত্তর ভিয়েতনাম ছিল হো চি মিনের দখলদারিতে, রাজধানী হ্যানয়। আমি ও মা কাম্বোদিয়া আর লাওস যেতে পারলেও উত্তর ভিয়েতনাম যেতে পারিনি, কারন তদানীন্তন সমাজতান্ত্রিক সন্দেহপরায়ণ বাতিকগ্রস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিসা দেয়নি। তবে বাবার মুখে শুনেছি উত্তর ভিয়েতনাম বড়ই গরিব, কিন্তু আদর্শবোধে উদ্দাম (হো চি মিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাবা বার খেয়ে বামপন্থী হয়েছিলেন; সত্তরের দশকে তাঁর সেই অবিমৃষ্যকারিতার দায় আমি সয়েছি); আর হ্যানয় তো প্রায় গ্রাম। দুই দেশ এক হয় পঁচাত্তরে; যারা ভাবেন দেশভাগ হলেই মানুষের দুঃখকষ্ট; তাদের সবিনয়ে জানাই ঠিক উল্টোটাও সমান সত্য। বাবার ভিয়েতনামি বান্ধবী Nguyêt (আক্ষরিক অর্থে চাঁদ, আমি বলতাম চাঁদুপিসি) বোট পিপল (Thuyền nhân Việt Nam) হয়ে ভেসে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন। চৌষট্টিতে বাবা ভারতে ফেরার পর চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল; ২০০২-এ বাবার উর্দ্ধগমনের খবরও তাঁকে দিয়েছিলাম। বর্ধমানের মহারাজার মত অভিমানে মানুষটি আর মাতৃভূমিতে পা রাখেন নি। আমিও আমার এবারের ভিয়েতনাম ভ্রমণের কথা তাঁকে জানাইনি। 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে; আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'!

অবশেষে হোটেল – সারা পথের ক্লান্তি আমার সারাদিনের তৃষা পেরিয়ে বাড়ি ছাড়ার সাতাশ ঘণ্টা পরে। হোটেলটি পছন্দ হল,ঘরে ঢুকেই চিতপটাং। দলের অপর আঠারো জন সদস্য ইতোপূর্বেই হ্যানয় পৌঁছে গেছেন, ট্যুর ম্যানেজার তাদের নিয়ে বেরিয়েছেন ভারতীয় রেস্তোরাঁয় খেতে; ফেরার পথে আমাদের দুজনের খাবার নিয়ে আসবেন।

গুড মর্নিং ভিয়েতনাম

তৃতীয় দিন পয়লা জানুয়ারি সকালে বেরিয়ে শহর ঘোরা। প্রথম গন্তব্য হ্যানয় শহরের কেন্দ্রে হোয়ান কিয়েম (Hoàn Kiếm –Lake of the Returned Sword) হ্রদের জেড আইলেট (Jade Islet)-এ ডেন গক সন (Đền Ngọc Sơn – Temple of the Jade Mountain) বৌদ্ধ মন্দিরে। জাতীয় বীর ট্রান হুং দাও (Trần Hưng Đạo) (১২২৮ – ১৩০০)-র নামে উৎসর্গীকৃত কনফুসিয়ান ও তাও বৌদ্ধদের মন্দিরটি বহুপুরাতন, ১৮৬৫-তে সংস্কৃত ও বিস্তৃত। বারো হেক্টরের সবুজ জলের হ্রদটি ভারি সুন্দর আর শান্ত। তরুবীথিময় পারিপার্শ্বিক, কুয়াশা বিছিয়ে আছে জল ছুঁয়ে, মৎস্যশিকারীরা ছিপ নিয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন, বাঁকে ফলমূল নিয়ে ভিয়েতনামি মহিলারা ফিরি করছেন, বেশ একটা নির্লিপ্তির ছোঁয়া চারিপাশে। রাস্তা থেকে কাউ থে হাক (Cầu Thê Húc – Welcoming Morning Sunlight Bridge) পেরিয়ে দ্বীপে, সেখানে মন্দিরের চারটি অংশ; থাপ বাট (Tháp Bút – Pen Tower), দাই জিয়েন (Dai Nghien – Ink-slab), দাক গুয়েত (Dac Nguyet – Moon Contemplation Pavilion) এবং দিন ট্রান বা (Đình Trấn Ba – Pavilion Against Waves)। এই মন্দির তাও বৌদ্ধদের, ফলে বুদ্ধ এখানে মোটাসোটা চৈনিক। নৈবেদ্যর উপচারে আম শশা জামরুল আনারস বাতাবি লেবু কমলালেবু ড্রাগন ফ্রুট প্যাশন ফ্রুট; পাশাপাশি পাউরুটি, ন্যুডলসের প্যাকেট, চা, কফি,এমনকি সিগারেট ও লাইটার। সত্যনারায়ণকে পান সুপারি দিতে পারলে অমিতাভ বুদ্ধকে সিগারেট লাইটার দিতে অসুবিধা কি; দুটোই তো নেশার জিনিস! একটু দূরে ভোগ বিলি হচ্ছে - ঠাণ্ডা স্টিকি রাইস, প্রায় আমাদের পান্তাভাত; সঙ্গে আমাদের পিঁয়াজির মত শুয়োরের মাংসের বড়া। ভোগ সর্বদাই অপ্রত্যাখ্যানীয়; আর এ আমিষভোগ অমৃততুল্য; তবে আলুনি। আমরা বেড়াতে বেরোলে শ্রীমতী পালের হ্যান্ডব্যাগে সর্বদাই ঘি,লবণ আর আমসি থাকে। তাই দিয়ে চেটেপুটে খেলাম। ইচ্ছে করছিল আমার ধর্মপ্রাণ, ফেসবুকে ঠাকুর দেবতার ছবি শেয়ার করা বন্ধুদের ডেকে ডেকে ভোগ খাওয়াই। বুদ্ধ তো বিষ্ণুর দশ অবতারের একজন; দশাবতার স্তোত্রে পড়েননি 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহং শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্! কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে'! তার ভোগ প্রত্যাখান করলেই সোজা নরকে; আমি আটকাতে পারব না। একটা কথা প্রায়ই মনে হয়। সেটা হচ্ছে ধর্মহীনরাই সম্ভবত ধর্মস্থানগুলির মাহাত্ম্য ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, কারন তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ; চেতনা উন্মুক্ত। আমি বুদ্ধের দেশ থেকে গেছি শুনে উদ্যোক্তারা প্রসাদের এক প্যাকেট সিগারেটও দিয়ে দিলেন।

লাল নদীর উপর লং বিয়েন ব্রিজ (Long Biên Bridge) (উদ্বোধন ১৯০৩) শহরের দুই ব্যস্ত অঞ্চল হোয়ান কিয়েম (Hoan Kiem) আর লং বিয়েন (Long Bien)-কে জুড়েছে। মূলত ভিয়েতনামের উত্তরাংশে ফরাসি কর্তৃত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যেই এই সেতু নির্মিত হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন বিমানবাহিনীর এফ ১০৫ যুদ্ধবিমান নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে এক বছরের জন্যে সেতুকে অচল করে দিয়েছিল। সেই থেকে এই সেতু শহর হ্যানয়ের আত্মমর্যাদার, আত্মসম্মানের প্রতীক, কবিতায় গানে তাকে নিয়ে আবেগের ছড়াছড়ি।

হ্যানয়ে গিয়ে সাইক্লো ট্যুর না করাটা প্রায় বারাণসী গিয়ে রাবড়ি না খাওয়ার মত অপরাধ। তিন চাকার এক-আরোহী রিকশা অতি খোলামেলা, চালক থাকেন পিছনে, তাই দৃষ্টি ব্যাহত হয় না মোটেও। দুঘণ্টা ধরে ধীরলয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে শহরের পুরনো ফরাসি পাড়া ঘুরে দেখতে পরিবেশবন্ধু এই বাহনটির জুড়ি নেই; চালকরাও পেশাদার, ভ্রমণকালে তারাই গাইডের কাজ করেন। হাজার বছরের হ্যানয় শহরের মেজাজটিকে ধরতে ও বুঝতে সাইক্লো ট্যুর অপরিহার্য। হোয়ান কিয়েম (Hoan Kiem –Old Quarter) অঞ্চল দিয়ে চলার সময়ে রাস্তার ভিড়, রাস্তার খাদ্য মেলা; আর বা দিন (Ba Dinh –French Quarter) অঞ্চল দিয়ে চলার সময়ে ফরাসি প্রাসাদরাজি দেখা তো হবেই, নাকে আসবে ফুলের ঘ্রাণ, রান্নার গন্ধ, কানে আসবে শহরের নিজস্ব কোলাহল। বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরে ভিয়েতনাম আধুনিক হয়েছে, তবে রিকশার ঐতিহ্যটিকেও বহাল রেখেছে।

ভিড়ঠাসা গলি দিয়ে আমাদের সাইক্লো যাচ্ছে, আর বাজার-মাসিরা ডাকছে, বাজারে আমাদের সব সবজি ফল-ফুলই উপলব্ধ; আপসোস হতে লাগল বাজারের থলেটা কেন আনলাম না। এরা খাটিয়ে জাত, সকালে কড়াইশুঁটি দিয়ে ফুলকপির তরকারি লুচি নির্মাণে শক্তিক্ষয় করে না; সবাই বাইরে খায়। তাই ফুটপাথের উপরে সারি সারি খাবারের আখড়া, সেখানে জলচৌকি, নিচু টুল বা পাবিহীন চেয়ারের ছড়াছড়ি। গরম গরম স্তিকি রাইস নুডল সুপের পাশাপাশি আস্ত আস্ত কুকুর শুয়োর ঝলসে রাখা। দলে দলে লোক ফুটপাথে বসে গরম গরম স্তিকি রাইস আর নুডল সুপ খাচ্ছে। আছে পুকুরের গেঁড়ি গুগলি, নুন ছড়িয়ে খাও। ওরা বলল ক্রিকেট – আমার দেখে মনে হল বিশুদ্ধ উচ্চিংড়ে – একটু ভাপিয়ে নিয়ে মধুতে ডুবিয়ে এরা যে কী পরিতৃপ্তির সঙ্গে খায় বলার নয়। অনেক দোকানে সন্দেহভঞ্জনের জন্য শুয়রের মাথাটি, বা আস্ত বড় মেঠে ইঁদুর (Bandicota indica) কিংবা আস্ত ছোট মেঠে ইঁদুর (Bandicota bengalensis) বা ধানজমির ইঁদুর (Rattus argentiventer) সগৌরবে ঝোলানো। আমাদের গাইড বলেছিলেন ইঁদুর খেলে যেন জ্যান্ত ইঁদুর দেখে ভাজতে বলি, কারন গ্রামাঞ্চলে মৃদু বিষ দিয়ে ইঁদুর ধরা হয়। তদনুযায়ী খাঁচা থেকে ইঁদুর বার করা হল, কাঠের গুঁড়ির উপর চপার দিয়ে তার চারটি পা, লেজ ও ঠোঁটটি বাদ দিয়ে চালের গুড়ো মাখিয়ে তাকে যখন কড়ায় ছাড়া হল, তখনও তিনি লাফাচ্ছেন। কিন্তু যেভাবে তার লোম থেকে দাঁত, অন্ত্র থেকে কান, কিচ্ছুটি বাদ না দিয়ে ভাজা হল, দেখে গা গুলিয়ে উঠল। য পলায়তি স জীবতি – মূল্য ধরে দিয়ে আমি সেখান থেকে হাওয়া। তবে ইঁদুর মহিলাদের মধ্যে অতীব জনপ্রিয়, যৌবন দীর্ঘায়িত করতে তার নাকি জুড়ি নেই। সবাই যে খাচ্ছে এমনটি নয়, অনেকে বসে স্রেফ কফি খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, সেলফোন ঘাঁটছে।

আমাদের অতিকায় বিলাসবহুল বাস থেকে নেমে যখন একে একে রিকশায় উঠছি, এক বুড়ো ভিয়েতনামি প্রত্যেকের ছবি তুলল। দুঘণ্টা পরে ঘুরেঘারে ফের যখন সেখানে, প্রত্যেকের হাতে ছবি ধরিয়ে বলে এক ডলার দাও। কেন রে! আমি কি তোকে ছবি তুলতে বলেছি? তুই কাউকে না বলে গ্রুপের মেয়েদের ছবি তুললি কেন? যা, ছবি নেব না। তখন বুড়ো বলে কী,ইফ নট তেক,আই দেস্ত্রয় ইত উইথ ফায়ার। ফায়ার ইস ব্যাদ লাক, কনফুসিয়াস তোলদ। এমনিতেই ধর্মগুরুদের নাম শুনলে আমার বিরক্ত লাগে,এখন আরও লাগল।

হ্যানয়ে এক কাফেতে আমরা এগ কফি (Cà phê trứng) খেতে গিয়েছিলাম। এগ কফি শুনে যারা ভাবছেন এটি সোনার পাথরবাটি বা কাঁঠালের আমসত্ব, তাদের সবিনয়ে বলি, সাবেকি উত্তর ভিয়েতনামি বিপ্লবীয়ানার এক প্রতীক এই কফি – তখন ওরা এতটাই গরিব ছিল যে কফিতে দুধ জোগাতে পারতো না, তাই ডিম। ডিমের কুসুম দিয়ে গোলা কফি, গরম রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কাপে পরিবেশিত – যেখানে কফির নিচে একটি লম্ফ জ্বলে। কাফেটি একটি সাবেকি বাড়িতে, কলকাতা বা তার আশেপাশের দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটি। উঠান - তাকে ঘিরে বারান্দা - বারান্দা পেরিয়ে ঘর - তার ছাদ অনেক উঁচু, দেওয়াল ভীষণ মোটা – আর হ্যাঁ, দেওয়ালে কুলুঙ্গিও আছে। একটা বড়সড় ঘরে চেয়ার টেবিল পাতা, বাইরে বারান্দার অংশটাতে কাউন্টার, ভাঁড়ার, রান্নাঘর। সেখানে টিভিতে ভিয়েতনামি অনুষ্ঠান চলছে, একঝলক দেখে দেখি ওমা! এতো আমাদের কৌন বনেগা ক্রোরপতি গো! এগ কফির পাশাপাশি সেখানে আর দুরকম ভিয়েতনামি কফি পাওয়া যায় - Cà Phê Sữa Đá বা ভিয়েতনামি বরফ কফি, এবং Cà Phê Cot Dua বা নারকোল দেওয়া কফি। এছাড়া পরিচিত কফিগুলি – অ্যাফোগাতো, কাফে মোচা, ল্যাতে ম্যাকিয়াতো, এস্প্রেসো, ক্যাপুচ্চিনো, কোল্ড ব্রিউ কফি – তো আছেই।

কাফেটিতে সাকুল্যে চারটি কর্মী, এক প্রৌঢ়া, দুই যুবক আর এক যুবতী। এত ফর্সা আর এত রোগা এরা যে দেখে বয়স বোঝা যায় না। আমরা এগ কফির ফরমাশ করে বসে আছি, শ্রীমতী পাল দেখলাম খুব মন দিয়ে ওই চারজনকে দেখছেন। তিনি বললেন 'ছেলেদুটো ভিয়েতনামি স্ট্যান্ডার্ডে অবিশ্বাস্য ভাল ইংরিজি বলছে, আর ওদের চেহারাতেও দেখো একটু ককেশিয়ান ছাপ আছে। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে!' এগ কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সময় পেতে তিনি নারকোল দেওয়া কফির ফরমাশ করলেন, আমি রাজি হলাম না। নারকোল দেওয়া কফি খেতে খেতে তিনি সহসা উঠে গিয়ে দুরপ্রাচ্যের কায়দায় মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে প্রৌঢ়াটিকে বললেন 'জিন চাও। চাও বু সাং, বা।' (হ্যালো, গুড মর্নিং, মাসি -সেলফোনে গুগল করে দেখে নেওয়া)। মাসি খুব খুশি হলেন। ভিয়েতনামিরা বাঙালিদের মতই গল্প করতে পেলে আর কিছু চায় না। গল্প শুরু হয়ে গেল।

শ্রীমতী পাল ঠিকই দেখেছিলেন, ছেলেদুটোর চেহারায় ককেশিয়ান ছাপ আছে। প্রৌঢ়াটি তাদের মা, পিতা প্রয়াত। পিতা ছিলেন মার্কিন সেনা, ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫ – ১৯৭৫) এর সেনানী। যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন,তার পরিচর্যা করেছিলেন এক ভিয়েতনামি নার্সদিদি। ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫ সায়গন শহরের পতনের মধ্যে দিয়ে ওই যুদ্ধের সমাপ্তি। তারপর সেই মার্কিন সেনানী ভিয়েতনামে ফিরে আসেন সেই নার্সদিদিকে খুঁজতে, তার পরিবারকে খুঁজে পান; কারন সেই নার্সদিদি ততদিনে অকালপ্রয়াতা। তাকে না পেয়ে ওই সেনানী সেই নার্সদিদির ভাইঝিকে বিবাহ করেন। সেই অকালপ্রয়াতা নার্সদিদি এই প্রৌঢ়ার পিসি। কিছুদিন আমেরিকায় কাটিয়ে তারা দুজনেই ভিয়েতনামে ফিরে আসেন। যুবতীটি বড়ছেলের স্ত্রী, তিনি ভিয়েতনামি। ইতোমধ্যে নারকোল দেওয়া কফি শেষ; আমাদের দুজনের জন্যে এবারে ক্যাপুচিনো এল। বেড়াতে বেরিয়ে যতই আদিত্য চন্দ্রমা জ্যোতিষ্ক তটিনী রত্নাকর ইরন শৈল আগ্নেয়গিরি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখিনা কেন,শেষ পর্যন্ত দেখার জিনিষ তো একটিই – মানুষ।

বাবার মুখে শুনেছিলাম দূরপ্রাচ্যের লোক ভাত ঠাণ্ডা করে খায়। তদুপরি ওদের দেশে আরামবাগ নেই, ফলে আরামবাগের রাইস মিলও নেই, তাই ওরা আমাদের মত ধান প্রক্রিয়াকরণ জানে না; কিভাবে ধান থেকে চাল বার করে কে জানে, ভাত খুব আঠালো হয়। সেই আঠালো ভাতের গোল্লা পাকিয়ে চপস্তিক দিয়ে বাগিয়ে ধরে খায় – সঙ্গে মাংস। তা সে মাংস গরুর হতে পারে, হতে পারে শুয়োরের। এই অবধি ঠিক আছে – তবে কুকুরের বা মেঠো ইঁদুরের মাংস হলেও নাকি আশ্চর্যের কিছু নেই। হ্যানয়ে শুয়োরের কাঁচা রক্তের পুডিং (Tiết canh) খেয়ে দেখলাম; দিব্যি লাগল। তবে কুকুর খাওয়া অত সহজ নয়, কুকুরের মাংস অতি মহার্ঘ – ফলে গরু বা শুয়োরের মাংসের সঙ্গে কেউ ভাগাড়ের কুকুরের মাংস মিশিয়ে দেবেন, এমন সম্ভাবনা নাস্তি। ফলে এক অভিজাত ডগ মিট রেস্তরাঁয় গিয়ে কুকুরের ভাপানো মাংস চিংড়ি চালগুঁড়োর পদ (Rựa Mận) খেতে হল। খরচ পড়ল বিস্তর। খরচটি বাঁচানো যেত, কারণ আমাদের ভ্রমণসংস্থা অভ্যস্ত খাবার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তা তারা দিচ্ছেনও। তবে লন্ডন গিয়ে যদি ফিশ এন্ড চিপস না খেলাম, বালি গিয়ে যদি মি গোরেং না খেলাম, তাহলে শুধু শুধু পয়সা খরচ করে যাওয়া কেন! তবে ট্যাঁপা মাছ খেতে সাহসে কুলোয়নি। এ আমাদের দিঘার সবজেটে ট্যাঁপা (Green Pufferfish / Chelonodon fluviatilis) নয়, কালো অতিকায় ট্যাঁপা।

রাস্তাঘাটে ফুলের মেলা; দোকানের সামনে, ফুটপাথে আলঙ্কারিক ফুলের পসরা; সাইকেলে, দ্বিচক্রযানে, ভ্যানরিকশায়, বাঁকে করে ভিয়েতনামি দিদিরা ফুল বিক্রয়ে ব্যস্ত - তাদের মাথায় সাবেকি ভিয়েতনামি টুপি (nón lá); দেখলেই মন ভালো

সকালে তিন ঘণ্টার জন্য খোলে,এবং দেখার কোন আগ্রহও ছিল না। নিজের দেশেই তিনি প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছেন,তাঁর রাজনৈতিক লাইন আর্থিক নীতি পঁচানব্বইয়ের পর পরিত্যক্ত, চিনের সঙ্গে চূড়ান্ত মন কষাকষি, সেই আমেরিকার সঙ্গে নৈকট্য। যুদ্ধে তাহলে জিতল কে? আমেরিকা তো ঠিক এটাই চেয়েছিল, কমিউনিজমের প্রসার রোধ, মুক্ত অর্থনীতি। যুদ্ধজয় কি তবে পাইরহিক ভিকট্রি (Pyrrhic victory)?

অপেরা হাউস, সেন্ত জসেফ'স ক্যাথেড্রাল দেখে যাওয়া হল লোটাস ওয়াটার পাপেট শো দেখতে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের শো, ছোট ছোট দশটি আখ্যান, এবং বিষয়বস্তুগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিতির সুবাদে – যথা খেঁকশিয়ালের হাঁস ধরা, নদীতে মাছ ধরা, পুকুরে মহিষকে স্নান করানো, ধান রোয়া – দেখে ভারি মজা লাগল। ওয়াটার পাপেট্রি শো (Múa rối nước) উত্তর ভিয়েতনামের লাল নদীর অববাহিকা অঞ্চলের এক সমৃদ্ধ লোককলা, উৎস একাদশ শতাব্দীতে জলভর্তি ধানক্ষেতের শ্রমিকদের সৃষ্টিশীল বিনোদনে। কাঠ আর লাক্ষার পুতুলগুলি কোমরসমান জলে দাঁড়িয়ে নাচ দেখায়, নাচ পরিচালিত হয় পর্দার পিছন থেকে, পুতুলের সঙ্গে যুক্ত লম্বা লাঠির মাধ্যমে – মনে হয় পুতুলগুলি যেন জলের ওপর নাচছে।

হাই হ্যালং

চতুর্থ দিন দোসরা জানুয়ারি সকালে চার ঘণ্টার বাসযাত্রা, গ্রামীণ ভূচিত্র ফুঁড়ে সাবেকি মিটারগেজ রেললাইন দেখতে দেখতে কিউয়াং নিনহ (Quảng Ninh) প্রদেশের হালং উপসাগর (Vịnh Hạ Long) তীরবর্তী হালং আন্তর্জাতিক ক্রুইজ বন্দরে। পথে এদের অভিনব সৎকার পদ্ধতি দেখা হল। মৃত্যুর পর দেহ সমাহিত করা হয় বাড়িলাগোয়া জমিতেই, কবর চেনার সুবিধার জন্য তার ওপর লাগানো হয় জবা, করবী বা টগর জাতীয় ছোট ফুলের গাছ। ছ বছর পর এক মধ্যরাত্রে, তা ফের তুলে হাড়গোড় ধুয়ে মুছে, সুগন্ধি ছড়িয়ে তা পাকাপাকি ভাবে সমাহিত করা হয়। লোকবিশ্বাস, ওই ছ বছর বাড়ির কাছাকাছি থেকে মানুষটি অশুভ সকল শক্তি থেকে বাড়িটিকে ও তার বাসিন্দাদের রক্ষা করেন।

হালং কথাটির অর্থ নেমে আসা ড্রাগন। অনেক অনেক বছর আগে,যখন ভিয়েতনামি জনগণ চিনের ছায়া থেকে বেরিয়ে তাদের জাতীয় পরিচিতি ও জাতীয় সত্ত্বার খোঁজে উন্মুখ,আকাশ থেকে দেবতারা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই ড্রাগনদের। হালং উপসাগরের আয়তন ১,৫৫৩ বর্গ কিলোমিটার, সেখানে হাজার দুয়েক পাহাড়,অধিকাংশই চুনাপাথরের – ৫০০ মিলিয়ন বছর ধরে প্রকৃতির আপন খেয়ালে গড়ে ওঠা। দশ হাজারেরও বেশি বছর আগে এখানে মনুষ্যবসতি ছিল। সেখান থেকে মাঝারি (কুড়ি আসনের) নৌকা চেপে আমাদের জাহাজে, গ্রে লাইন ক্রুইজ। সংস্থাটি অতীব প্রামাণ্য, ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত; তাদের আহারের বড়ই পারিপাট্য,তাদের জাহাজে অবস্থিতি বড়ই বিলাসবহুল। অপরাহ্নে আবার মাঝারি কুড়ি আসনের নৌকা (Tenderboat) চেপে আরেক বন্দরে, বলা হল তুমি একা কায়াকিং করতে পারো, নচেৎ আমাদের ছোট দশ আসনের নৌকা তোমাকে এই অঞ্চলটি ঘুরিয়ে দেখাবে। দ্বিতীয় পছন্দে বিস্তর ঘোরাঘুরি হল, নীল কাকচক্ষু জল, ঢেউ নেই, যতদূর চোখ যায় জলে এক টুকরোও কাগজ বা প্লাস্টিক ভাসছে না। জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলেছে অতিকায় চুনাপাথরের পাহাড়, তাদের মাথায় বৃষ্টি-অরণ্যের টুপি। জীববৈচিত্রের শেষ নেই – বাঁদর, পাখপাখালি, খরগোশ, কাঠবেড়ালি। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে নৌকা চড়ে ভারি মজা হল। মাঝারি কুড়ি আসনের নৌকা চেপে আরেক দ্বীপে, তার নাম টি-টপ দ্বীপ। দ্বীপে নেমেই সব্বাই দুদ্দাড় করে পাহাড়ে উঠে গেল সূর্যাস্ত দেখতে। আমার অত পরিশ্রম পোষালো না; বিশেষত সূর্য যখন আমাদের ওখানেও ডোবে, রোজই ডোবে।

অসমান সৈকতে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম;এবং অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়লাম। সূর্যস্নানরতা এক গৌরী বালিকা এসে তুললেন,'আঙ্কল,আহিস্তা'। এবারে আমার চমৎকৃত হওয়ার পালা। জানা গেল মা জননী কলম্বিয়ার মেয়ে, মেয়েদের ফুটবল খেলতে ভারতে এসেছিলেন; তারপর থেকে গিয়েছেন, হায়দ্রাবাদের এক ইস্কুলে অর্থনীতি পড়ান। একা একা একটা মেয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরোচ্ছে; ওর মার রাতে ঘুম হয়; দুশ্চিন্তা হয় না? শ্রীমতী পাল বেরসিক মানুষ, রাত্তিরবেলায় তিনি আনারসের রস খেতে চাইলেন। আমি দেখলাম আস্ত আনারস সাজানো, পাশে মিক্সারও আছে। আমি তাদের বললাম পাইনাপল জুস, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম আনারস,মিক্সার। লস্যি ঢালাঢালির ভঙ্গি করে,দুহাত ওপর নিচে করে বললাম জুস। তারা কিছুই বুঝল না। সারা জাহাজে একজনই ইংরিজি জানে, বিপদে পড়ে তাকে ডেকে আনলো,সে আমার কাছে শুনে ওদের বলল ত্রাই দুরা নুয়ক এ – তবে আনারসের রস মিলল। রাতে জাহাজের ডেকে; ঠাণ্ডায় সেখানে কেউ নেই। উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত আকাশ, অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে চুনাপাথরের পাহাড়গুলি; জাহাজ খুব ধীরে চলছে। বাতাসে জলের টান।

পরদিন ভোর হতে না হতেই দেখি সমুদ্রময় অগণন ডিঙি নৌকা, আমাদের জাহাজ ঘিরেও কয়েকটি। প্রৌঢ়া ভিয়েতনামি পিসিমারা চিপস, কলা, কাচের বোতলে জল (পুরো হালং উপসাগরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ), আনারস, জামরুল, ফ্লাস্কে গরম জেসমিন চা ইত্যাদি নিয়ে জাহাজের আরোহীদের কাছে বিক্রি করতে এসেছেন। প্রাতরাশ সেরে আমরা মাঝারি নৌকায় বন হন (Bo Hon) দ্বীপের সর্ববৃহৎ গুহা (১০,০০০ বর্গ মিটার) সাং সৎ (Sung Sot –Surprise Cave) । ১৯০১ সালে এটি আবিষ্কার করে ফরাসিরা এত আশ্চর্য হয়েছিল যে এর নাম রেখেছিল "গ্রতে দেস সারপ্রাইজেস (Grotte des Surprises)"। বর্তমানে এটি ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। সারা গুহা জুড়ে নানা রঙের পাথর।

সেখান থেকে জাহাজে ফিরে গুছিয়ে নিয়ে বাসযাত্রা। এবারে সরাসরি বিমানবন্দরে, পথ কিছুটা কম, কিন্তু সময় লাগল অনেকক্ষণ কারণ পথিমধ্যে এক মুক্তা ফার্মে ও এক সুপারমার্কেটে দাঁড়িয়েছিলাম। মুক্তা ফার্মটি বিশাল, সেখানে কালচারড মুক্তার চাষ, আর সুপারমার্কেটটি (Hong Ngoc Fine Arts Co. Ltd and Chan - Thien - My Co. Ltd. 110B Ngọc Hà, Ba Đình, Hanoi, Vietnam। www.hongngocvn.com) অতিকায়। ভিয়েতনামে রাস্তার ধারে ধারে মূলত বিদেশি পর্যটকদের কথা ভেবে এমন সুপারমার্কেটের ছড়াছড়ি। বেশ আন্তরিক, এসো ভাই, বসো ভাই গোছের ব্যাপার। ওয়াশরুমে যাও, পয়সা লাগবে না। লাউঞ্জে স্লিপিং পড পাতা আছে, ঠ্যাং ছড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে নাও, পয়সা লাগবে না। তারপর ডিম গোলা কফি খাও, হরেক কিসিমের চা (বাম্বু টি জেসমিন টি, লোটাস টি, সিত্রাস টি, হনি টি, বাম্বু টি, এগ টি, লিচি টি, জিনসেং টি, ম্যাঙ্গো টি......)খাও, ফলের রস খাও – প্রথম গেলাস পয়সা লাগবে না, যদি অন্য পানীয় খেতে সাধ জাগে, নিজেকে বঞ্চিত করো না; জানো তো জীবন একটাই। এমন মানবজনম আর পাবেনা – বারে বারে আর আসা হবে না। আর হ্যাঁ! তোমাদের বাস এখানে দেড় ঘণ্টা থামবে। তাই এইসব করে সময় থাকলে আমাদের দোকানটা একটু ঘুরে যেও। আমাদের দোকানের দশটা প্যাভিলিয়ন – ভাস্কর্য, জেমস্টোন, এমব্রয়ডারি, ল্যাকার পেন্টিং, জামাকাপড়, হাতব্যাগ, ভিয়েতনামি পটারি, তোয়ালে, ল্যাকার ও কিউি টেবিলক্লথ এবং ব্যাগ; আর জানোই তো! পুরোটাই একতলায়।

শুরুতেই ভাস্কর্যের প্যাভিলিয়ন; বুদ্ধের নানাবিধ মূর্তি। তবে ইনি আমাদের দেখা ভারতীয় বুদ্ধ নন, তাও বৌদ্ধদের বুদ্ধ; মোটাসোটা চৈনিক। আমাদের দেখেই একজন দৌড়ে এলেন – পছন্দ করো, ঠিকানা দিয়ে যাও, পাঠিয়ে দেব। হাজার হলেও তোমরা বুদ্ধের দেশের লোক, তোমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশন করে দেব। জেমস্টোন, এমব্রয়ডারি ও ল্যাকার পেন্টিং ভিয়েতনামের প্রথাগত শিল্প-পর্যটকদের অবশ্যক্রীতব্যর তালিকায় পড়ে। আমরা যাওয়ার আগেই ভেবে গিয়েছিলাম কিনব; গাইডও বললেন এখান থেকেই কিনে নাও, সায়গনে দাম অনেক বেশি।

সুপারমার্কেটের বিক্রয়বালিকাগুলি সদাচঞ্চল প্রায় কিশোরী। তারা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি, একটা প্যাভিলিয়ন দেখা হয়ে গেলে সেই প্যাভিলিয়নের বালিকাটি আমাদের পরবর্তী প্যাভিলিয়নের বিক্রয়বালিকাটির হস্তে সমর্পণ করে যাচ্ছে। এবারে জামাকাপড়ের দপ্তরে। আমাদের বাজারফর্দয় ভিয়েতনামের জাতীয় পোশাক আও দাই (áo dài) ছিলই – এখানে দেখলাম নানা মাপের নানা রঙের নানা ধাঁচের áo dài থরে থরে সাজানো। কিন্তু জামাকাপড় তো আর ছবি বা পাথর নয় যে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম ওইটি দাও। আমরা ঠিক কী চাইছি সেটি বিক্রয়বালিকাটিকে বোঝাতে গলদঘর্ম। শ্রীমতি পাল পুত্রবধূ ও পৌত্রীর জন্য ভিয়েতনামের áo dài কিনবেন, কিন্তু বিক্রয়বালিকাটি বিন্দুমাত্র ইংরিজি বোঝে না; আরও আশ্চর্য লাগল এই কারণে যে এইসব সুপারমার্কেট ভিনদেশি পর্যটকদের জন্যেই। বিক্রয়বালিকাটি আমাদের ছাড়বে না। শ্রীমতী পাল প্রায় চড় বাগিয়ে তাকে বোঝাতে লাগলেন ফাইভ ইয়ার গার্ল; পিঙ্ক একটা; আর অনর্গল বাংলায় বলে গেলেন তোমার সাইজের আরেকটা, হাতাওয়ালা, গোলাপি রঙের। সে কি বুঝলো কে জানে, ঠিক জিনিসটিই বার করে আনলো।

তারপরেও পাঁচটি প্যাভিলিয়ন; হাতব্যাগ, ভিয়েতনামি পটারি, তোয়ালে, ল্যাকার ও কিট্টি টেবিলক্লথ এবং ব্যাগ। শ্রীমতি পাল সব প্যাভিলিয়ন থেকেই কিছু না কিছু কিনলেন; খেলনা, টুপি, রুমাল। ভারতীয় রুপি মার্কিন ডলার ভিয়েতনামি ডং এর পারস্পরিক বিনিময়হারের জটিল অঙ্ক বুঝিনা বলে দোকানের বিল মিটিয়েছিলাম ভারতীয় কার্ডে, ভারতীয় রুপিতে; দেখলাম বিল খুব বেশি হয়নি। তবে ওই দেড় ঘণ্টার রাজকীয় অভ্যর্থনা জীবনভর মনে থাকবে। বার বার মনে পড়ছিল জাতীয় বা রাজ্য সড়কের ধারে, কৃষ্ণনগর বা পলষন্ডা, আসানসোল বা ধলডাঙ্গার ধাবাগুলি। তারাও তো এমনটি হতে পারতো - দীর্ঘ সড়কযাত্রার যাত্রীকে অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবাটুকু দিয়ে বাণিজ্য করতে।

~ ক্রমশ ~

হিসাবশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর শ্রী তপন পাল West Bengal Audit & Accounts Service থেকে অবসর নিয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর উৎসাহের মূল ক্ষেত্র রেল - বিশেষত রেলের ইতিহাস ও রেলের অর্থনীতি। সে বিষয়ে লেখালেখি সবই ইংরাজিতে। পাশাপাশি সাপ নিয়েও তাঁর উৎসাহ ও চর্চা। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য শ্রী পালের বাংলায় ভ্রমণকাহিনি লেখালেখির প্রেরণা 'আমাদের ছুটি'। স্বল্পদূরত্বের দিনান্তভ্রমণ শ্রী পালের শখ; কারণ 'একলা লোককে হোটেল ঘর দেয় না।'

বাঘের বাসা থেকে ফিরে আসা

সুবীর কুমার রায়

২০১৯ সালের ১৭ জানুয়ারি। ভুটানের 'হা' শহর থেকে ফিরে পরের দিন তাক্তসাং, যা টাইগার্স নেস্ট নামে পরিচিত, যাওয়ার কথা। কিন্তু গতকাল চেলেলা পাসের ওপর দিয়ে 'হা' শহরে যাওয়ার সময় বরফেঢাকা রাস্তায় বারবার গাড়ির চাকা পিছলে যাওয়ায়, ড্রাইভার ওই রাস্তায় গাড়ি নিয়ে আর এগোতে সাহস করছে না। সেখান থেকে 'হা' শহর আরও প্রায় ৩৯ কিলোমিটার পথ। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে, চেলালা থেকে প্রায় ১২-১৩ কিলোমিটার আগে, বরফের ওপর কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে পারো শহরে ফিরে আসি। পরিবর্তিত পরিকল্পনামত, আজ তাই বেশ ভোরে আমাদের টাইগার্স নেস্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কথা। কিন্তু, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সময়মতো সবাই তৈরি হতে না পারায়, হোটেলের নিচে গাড়ি এসে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও, বেরোতে একটু দেরিই হয়ে গেল।

পারো শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে, সম্ভবত 'রামথাংখা' নামের এক জায়গা থেকে টাইগার্স নেস্টের উদ্দেশ্যে হাঁটাপথের শুরু। ঘন্টাখানেক পরে যখন নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হলাম, তখন বেলা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। সমস্যা একটাই, সঙ্গে তিনজন মহিলা রয়েছেন, যাদের মধ্যে দুজনের প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়স এবং হাঁটুর রীতিমতো সমস্যা। শুধু তাই নয়, তিনজনের মধ্যে দুজন আগে কিছু ট্রেক করে থাকলেও, একজন আবার ট্রেকের সঙ্গে পূর্বপরিচিত নন। আমি যদিও কিছু ট্রেক করেছি, কিন্তু বাইপাস অপারেশন করা সাড়ে ছেষট্টি বছর বয়সে, মনোবল এখনও কিছু সঞ্চিত থাকলেও, শারীরিক বল যে তলানিতে এসে ঠেকেছে, অস্বীকার করি কিভাবে।

যাইহোক, গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই কাউন্টার থেকে মাথাপিছু পাঁচশত টাকা করে টিকিট কিনে নিলাম। টিকিট ছাড়া ওপরে যাওয়া যায় কি না জানি না। যাওয়া হয়তো যায়, কিন্তু টিকিট ছাড়া তাক্তসাং অর্থাৎ টাইগার্স নেস্টের মঠের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় কি না, বা ওপরে টিকিট কাটার কোনো ব্যবস্থা আছে কি না, জানা নেই। এরপরে লাঠিপিছু পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় বেশ শক্তপোক্ত পাঁচটা লাঠি নিয়ে নেওয়া হল। ফেরার পথে ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। একশো টাকা দিলে অবশ্য লাঠির মালিকানা পাওয়া যায়।

কেউ বলল এখান থেকে প্রায় ৪ মাইল পথ, কেউ বলল সাড়ে ৪ কিলোমিটার পথ, কেউ আবার বলল ৬ কিলোমিটার পথ হেঁটে, প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চতা অতিক্রম করে, ১০,২৩২ ফুট উচ্চতায় এই বিখ্যাত মঠটি অবস্থিত। এটিকেই ভুটানের বৌদ্ধ ধর্মের জন্মস্থান বলে মনে করা হয়। তিব্বতি ভাষায় তাক্তসাং কথার অর্থ নাকি বাঘের গুহা, বাঘ নিয়ে অবশ্য অনেক গল্প শোনা যায়। অষ্টম শতাব্দীতে গুরু পদ্মসম্ভব (গুরু রিনপোচে) তিব্বত থেকে বাঘিনীর পিঠে করে নাকি এই তাক্তসাং গুহায় এসে তিন বৎসর তিন মাস তিন সপ্তাহ তিন দিন তিন ঘন্টা তপস্যা করেন। পরবর্তীতে ১৬৯২ সালে এই মঠটির প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে প্রচলিত। বাঘ নিয়ে আরও গল্প আছে, সেকথা থাক, তবে এতটা পথ এই খাড়াই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হবে শুনে, মহিলাদের মুখচোখে বেশ দুশ্চিন্তার মেঘ চোখে পড়ল। এগিয়ে চললাম, ড্রাইভার সোনম নিচে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে বলে জানাল। সামান্য একটু পথ ওপরে উঠে খানিক সমতল মতো জায়গায় দেখলাম, কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে মালিকরা যাত্রীর আশায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝরাস্তায় অসুবিধায় পড়লে ঘোড়া পাওয়া যাবে কি যাবে না ভেবে, তাদের সঙ্গে কথা বললাম। জানা গেল, মোটামুটি মাঝামাঝি দূরত্বে ক্যাফেটেরিয়া পর্যন্ত ঘোড়া যায়, তারপরে আর না। ঘোড়াকে যেতে দেওয়া হয় না নাকি ঘোড়া যেতে পারে না, ঠিক বোঝা গেল না। তবে ফেরার পথে কোনো অবস্থাতেই ঘোড়ার পিঠে মানুষ তোলা হয় না। প্রতিটি ঘোড়ার জন্য ছয়শত টাকা করে ভাড়া দিতে হবে। ঘোড়া যাওয়া আসার গল্প শুনে, রাস্তা সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা করে নিয়ে, তিনজন মহিলার জন্য তিনটি ঘোড়া পনেরোশ টাকায় ঠিক করে দেওয়া হল। একটা ঘোড়ার দায়িত্ব আবার একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চার হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। ওরাও খুশি, আমরাও খুশি। ঘড়িতে তখন সকাল পৌনে দশটা, ঘোড়ারা এগিয়ে চলল, আমাদের জন্য ক্যাফেটেরিয়ার কাছে অপেক্ষা করতে বলে দিলাম।

বিদেশিনীর দেখা পেলাম। কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ আবার নিজের পায়ে, তবে হেঁটে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের প্রায় সকলের দলের সঙ্গেই আলখাল্লার মতো ভুটানের জাতীয় পোশাকপরিহিত গাইড আছে। বুঝতে পারছি, আমার হাঁটার মধ্যে এবার স্বাচ্ছন্দ্যের বেশ অভাব। পিঠে যেটুকু মাল আছে, সেটাই বেশ ভারী ও কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে। তরুণ আমার থেকে প্রায় বছর ছয়েকের ছোট, কাজেই আমার মতো না হলেও ওর হাঁটার মধ্যেও কষ্টের ছাপ স্পষ্ট। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে লজেন্স মুখে দিয়ে এগোতে হচ্ছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের একটা বেশ বড় একটা দলকে দেখছি, বারবার রাস্তার পাশে পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। যদিও বিশ্রামের থেকে নিজেদের মধ্যে গুলতানি করতে ও সেলফি তুলতেই বেশি ব্যস্ত। এক একসময় আমাদের অতিক্রম করে তারা আবার এগিয়েও যাচ্ছে। বয়স বোঝা মুশকিল, তবে খুব বেশি বয়স নয়, এমন এক বিদেশি যুগলকে বারকতক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এগোতে দেখার পর দেখলাম, সম্ভবত স্ত্রীকে গাইডের সঙ্গে এগিয়ে যেতে দিয়ে, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন। যাঁরা বেশ ভোরবেলা বেরিয়েছিলেন, এখনো তাঁদের ফেরার সময় হয়নি। তবে মাঝেমাঝেই উলটো দিক থেকে কিছু যাত্রীকে নিচের দিকে নেমে যেতে দেখছি, জানি না, তাঁরা শেষপর্যন্ত যেতে অক্ষম হয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছেন কিনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দশ-বারো বছরের ছেলেটাকে, যে আমাদের দলের একজনের ঘোড়ার সঙ্গে ওপরে গিয়েছিল, তার ঘোড়া নিয়ে নিচে ফিরে যেতে দেখলাম। সে জানাল, আমাদের দলের তিনজনকেই তারা ক্যাফেটেরিয়ার কাছে ভালভাবে নামিয়ে দিয়েছে। এইভাবে গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তা ভেঙে, একটা জায়গায় এসে অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের আরেকটা দলের সাক্ষাৎ পেলাম। এরা সবাই বাংলাদেশ থেকে এসেছে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, সবাই ওদের দেশে আই.টি.সেক্টরে কাজ করে। জানাল যে, থিম্পুতে একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিল। টাইগার্স নেস্ট না দেখলে ভুটান আসা সার্থক হয় না, তাই টাইগার্স নেস্ট দেখে দেশে ফিরে যাবে। তাদের সঙ্গে কথা বলে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে, ক্যাফেটেরিয়া অঞ্চলে এসে পড়লাম। উজ্জ্বল রঙিন কাপড়ের টুকরো দিয়ে গোটা জায়গাটা সাজানো। কাপড়ের ওপর সংস্কৃত ও অন্য কোনো ভাষায়, সম্ভবত বুদ্ধের বাণী লেখা। বামদিকে টাইগার্স নেস্ট যাওয়ার রাস্তা, ডানদিকের বাঁধানো সরু রাস্তা কিছুটা নিচে ক্যাফেটেরিয়া পর্যন্ত গেছে। সেখানে আমাদের দলের কাউকে না দেখতে পেয়ে, কিছু ছবি তুলে, ক্যাফেটেরিয়া পর্যন্ত হেঁটে গিয়েও কারও সন্ধান পেলাম না। ক্যাফেটেরিয়ায় জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ওখানে তিনজন মহিলার কোনও দল আসেনি। এবার চিন্তা শুরু হল। গেল কোথায় ওরা? এতক্ষণে আমরা মাত্র অর্ধেক পথ এসেছি, এটুকু ওরা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো ঘোড়ায় চেপে আসলেও, বাকি অর্ধেক পথ আর গোটা ফেরার পথটা কিন্তু হেঁটে যেতে হবে। তরুণের কথায় এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুটা পথ ভেঙে ওপরে উঠে দেখলাম, দুটো বেঞ্চিতে ওরা বসে আছে। আমরাও বসে সবাইকে কমলা লেবু দিলাম। আরও কিছুক্ষণ বসে, ওদের তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললাম। মুখ-চোখ, হাঁটার গতি ও চলার ছন্দ জানিয়ে দিচ্ছে যে ওরা বেশ ক্লান্ত। পাথুরে রাস্তা ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে কখনও হাত ধরে সাহায্য করে, কখনও মৌখিক উৎসাহ দিয়ে, এগিয়ে নিয়ে চলেছি। ধীরে ধীরে ওদের গতি কমতে শুরু করলেও, বেলা বাড়তে লাগল। হঠাৎ উলটোদিক থেকে বাঙালি ছেলেদের একটা দল এসে হাজির হল। মুখোমুখি হতেই তাদের কথা শুরু হল। এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, অন্যকে নিরুৎসাহ করার মধ্যেই যাঁরা নিজেদের ভ্রমণ, বিশেষ করে ট্রেকিং-এর সার্থকতা খুঁজে পান। এরাও দেখলাম সেই প্রজাতির মানুষ। মহিলাদের খুব কষ্ট করে চড়াই ভাঙতে দেখে তারা সাহেবি কেতায় শুরু করে দিল— “আপনাদের হ্যাটস অফ! ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। খুব কষ্টকর রাস্তা কাকিমা। সামনেই সাতশ ষাটটা সিঁড়ি ভেঙে আপনাদের মন্দিরে যেতে হবে”, ইত্যাদি ইত্যাদি। চুয়ান্নটা সিঁড়ি ভেঙে আমাদের ফ্ল্যাটে উঠতে হয়। দিনে বেশ কয়েকবার আমাকে ওপর নিচে যাতায়াত করতে হলেও, আমার উনি সিঁড়ি ভাঙার ভয়ে নানা অজুহাতে নিচে নামতে চান না। এহেন একজন মানুষকে হঠাৎ সাতশ ষাটটা সিঁড়ি ভাঙার গল্প শোনালে, তার মানসিক অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। কোনোরকমে তাদের বিদায় করে আমরা এগিয়ে চললাম।

ধীরে ধীরে হাত ধরে, প্রয়োজনমত সাহায্য করে, একসময় সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছলাম, যেখান থেকে মঠগুলোর গঠনশৈলী সবথেকে পরিষ্কারভাবে দেখে মুগ্ধ হতে হয়, আবার শ'য়ে শ'য়ে পাথুরে সিঁড়ি নিচে নেমে যেতে দেখে আতঙ্কিতও হতে হয়। একটা নিরেট তেলতেলে শক্ত পাথরের প্রায় খাঁজহীন পাহাড় যেন অনেক ওপর থেকে সোজা নিচ পর্যন্ত নেমে গেছে, আর তার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, কেউ যেন কিছুটা জায়গা তরোয়াল দিয়ে কেটে সমান করে এমনভাবে মঠগুলো তৈরি করেছে, যে দেখে মনে হবে, মঠগুলো পাহাড়ের গায়ে ঝুলে আছে। আতঙ্কের আরও কারণ আছে। অনেক সিঁড়ি নামার পর, সংখ্যায় কিছু কম হলেও, আবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে মঠের কাছে যেতে হবে। আহা, আমাদেরও যদি একটা করে বাঘ বা বাঘিনী, নিদেন পক্ষে গুপি-বাঘার মতো জুতো থাকতো, তাহলে বেশ হত! বিভিন্ন রঙের রঙিন কাপড়বাঁধা একটা ব্রিজমতো পার হয়ে, আমরা গুণে গুণে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে শুরু করলাম। বাঁপাশে একটা ঝরনার জল, অনেকটা জায়গায় বেশ উঁচু বরফ হয়ে জমে আছে। অল্পকিছু সিঁড়ি ভেঙে নামার পরেই, মহিলাদের সিঁড়ি ভাঙায় সাহায্য করতে গিয়ে, সিঁড়ির সংখ্যা গোনার কথা ভুলে গেলাম। আগেই শুনেছিলাম সাতশ সিঁড়ি ভাঙতে হয়, একটু আগে বাঙালি ছেলেদের দলটার কাছে শুনলাম, সাতশ ষাটটা সিঁড়ি। এখন তো মনে হচ্ছে সংখ্যাটা কিছু বেশি হলেও হতে পারে।
ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় নিয়ে পাশের রেলিং ধরে বা আমাদের কাঁধ ও হাতের ওপর চাপ দিয়ে নামতে সাহায্য করে, একসময় ওদের দুজনকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামা পর্ব শেষ করতে সমর্থ হলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে, এবার শুরু হল সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার পালা। ওদের অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে, কষ্টও হচ্ছে, কিন্তু জানি, এই কষ্টের রেশ কয়েকদিন পরেই মুছে যাবে, কিন্তু সারা জীবন এই জায়গায় আসা ও তার আনন্দের রেশ বেঁচে থাকবে। হাত ধরে টেনে টেনে বিকেল প্রায় সোয়া তিনটে নাগাদ ওদের ওপরে উঠিয়ে নিয়ে আসতেও সমর্থ হলাম। বেশ বিকেল হয়ে গেছে, ফেরার পথে এবার আবার অনেক বেশি সংখ্যক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হবে। তাছাড়া ফেরার সময় সমস্ত পথটাই হেঁটে যেতে হবে। তাই এখানে আর বেশি সময় ব্যয় করা চলবে না। কাউন্টারে টিকিট দেখাতে, আমাদের হাতে একটা ছোট তালা দিয়ে পাশের লকারে ক্যামেরা, মোবাইল

ছাড়া বাকি অংশটি সোনার তৈরি বলে মনে হলো। এত শান্ত পরিবেশে আরও বেশ কিছুটা সময় কাটাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপায় না থাকায়, ওদের একটু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিয়ে, কাউন্টারের কাছে নেমে এলাম। লকার থেকে মালপত্র বের করে নিয়ে চাবি ও তালা ফেরৎ দিয়ে দিলাম। সঙ্গে অল্প জল থাকলেও, কিছুটা জল ভরে নেবার ইচ্ছা ছিল। পাশে 'হোলি ওয়াটার' লেখা খাবার জলের জায়গা থাকলেও, জুতো খুলে সেখান থেকে মগে করে জল ভরে আনা অসুবিধাজনক। ঘড়িতে প্রায় পৌনে চারটে বাজে, তাই ফেরার পথ ধরলাম। খাবার জলের ব্যবস্থাটা এখানে অনেক সহজলভ্য হওয়া উচিত বলে মনে হল।

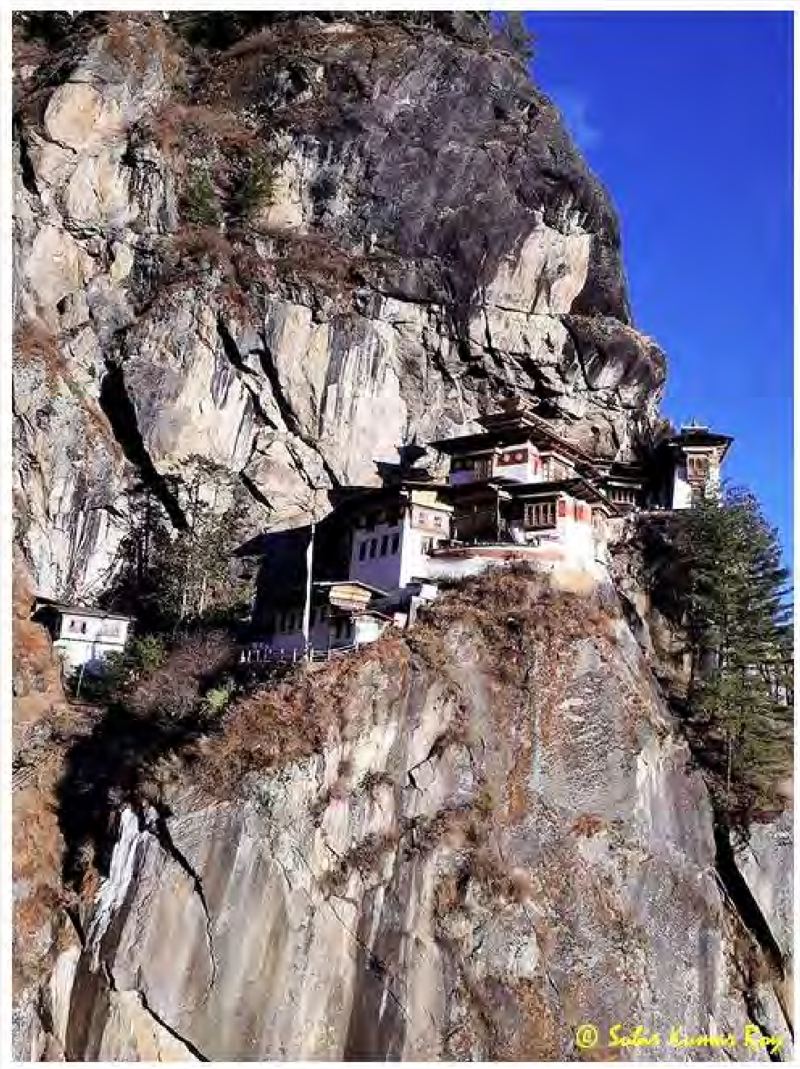

এবারেও প্রথমে সিঁড়ি ভেঙে নামতে হবে, তবে পরবর্তী পর্যায়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে চোখ পড়তে, ওদের কথা ভেবে

অনেককেই দেখেছিলাম, যাদের আর এখানে পৌঁছতে দেখলাম না। অনেকেই মাঝপথ থেকে বা শেষ প্রান্ত থেকে, ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। নিচে নামার সিঁড়িও একসময় শেষ হল, আমাদের বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মতো সমান উচ্চতার সিঁড়ি হলেও তবু একরকম ছিল, কিন্তু এই সিঁড়ির উচ্চতা তো একেকটা একেক মাপের। এবার ওঠার পালা, প্রায় পিছন ফিরে হেঁটে, স্ত্রীর হাত ধরে টেনে ওপরে তোলা শুরু করলাম। তরুণেরও প্রায় একই অবস্থা। ও নিজেও সীমার হাত ধরে প্রায় একই প্রক্রিয়ায় ওপরে উঠছে। ওরা আমাদের থেকে সামান্য এগিয়ে গেছে। তরুণের কন্যা পুপু অনেকটা এগিয়ে গেছে, ও এখন নজরের বাইরে। ধীরে ধীরে রোদের তেজ কমছে, অন্ধকার হয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা প্রবল, তাই সঙ্গিনীকে একটু দ্রুত পা চালাতে বললাম। যদিও জানি, বাস্তবে সেটা প্রায় অসম্ভব। অনেকটা সময় ধরে অনেক কসরত করে অনেক সিঁড়িভাঙার পর, ওপর থেকে তরুণ জানাল, যে সিঁড়িভাঙা পর্ব শেষ। তাতে উপকার কতটুকু হল জানি না, তবে মনে হল ওর মুখে শুধু ফুল চন্দন নয়, সাথে কিছু গুজিয়াও পড়ুক।

বেশ বুঝতে পারছি যে বেলা ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে, দিনের আলো দ্রুত কমতে শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু করার কিছু নেই। বারবার 'আর একটু গতি বাড়াও' বলতে বলতে, আমরা দুটি মাত্র প্রাণী, খুব ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছি। সীমার হাঁটুর অবস্থাও বেশ খারাপ, কিন্তু ওর যেটা আছে, তা হল বেড়ানোর প্রবল আগ্রহ ও অসম্ভব মনের জোর। তাছাড়া ওর কিছু ট্রেকিং-এর অভিজ্ঞতাও আছে। ওদের গতি কিছু বেশি হওয়ায়, ক্রমশ ওরাও চোখের আড়ালে চলে গেল। এইভাবে বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলেও আর চার দিন পরেই পূর্ণিমা, তাই হালকা একটা আলোর ভাব আছে। তবে তা এই ভাঙাচোরা পাথুরে নির্জন জঙ্গলের পথ চলার পক্ষে পর্যাপ্ত মোটেই নয়। পিছন থেকে কারও গলার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। শেষ অবাঙালি দলটার ফিরতে দেরি আছে, কিন্তু সেই অল্পবয়সি দম্পতি এখনও কেন এসে পৌঁছল না, বুঝতে পারছি না।

এইভাবে আরও কিছুটা পথ পার হয়ে দেখলাম একটা বেশ বড় পাথর, আর রাস্তাটা যেন তার দুদিক দিয়ে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। সঙ্গিনীকে দাঁড়াতে বলে, সরেজমিনে পরীক্ষা করে বাঁদিকের রাস্তাটাই আমাদের পথ বলে স্থির সিদ্ধান্তে এসে, বাঁদিকের পথ ধরে আবার এগিয়ে চললাম। এখানে কয়েকটা এবড়োখেবড়ো সিঁড়ির মতো ধাপ থাকায়, আরও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। স্ত্রীর হাত বেশ শক্ত করে ধরে, আমার দেখানো জায়গায় পা ফেলে ফেলে নামতে বলে কয়েক পা মাত্র নেমেছি, এমনসময় নীচে, খুব কাছ থেকেই তরুণের ডাক শুনতে পেলাম। বুঝলাম দেখা না গেলেও, ওরা খুব কাছাকাছিই আছে। দাঁড়াতে বলে সামান্য পথ এগিয়েই ওদের দেখা পেলাম ও তরুণের মুখে সেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বাক্যটি শুনলাম— "সুবীরদা, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি"। এই অন্ধকারে জঙ্গলে পথ হারানোর সবরকম বিপদের কথা ছেড়ে, আমার যেটা প্রথম মনে হল — আবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হলে কী করব? তরুণ জানাল, সামনে কোনো রাস্তা নেই। সবাইকে দাঁড় করিয়ে, কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ডানদিকে একটা সরু রাস্তার মতো পথ আগাছার জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। বামদিকের রাস্তাটা অধিকতর চওড়া হলেও সেটা একটু এগিয়েই শেষ, কাজেই সেটা আমাদের ফেরার রাস্তা হতে পারে না।

প্রায় সাত দিন হল ভুটানে আছি। সন্ধ্যার পর থেকে সর্বত্র ভীষণ ঠাণ্ডা, সকালে রাস্তার পাশেও গাড়ির ওপর বরফ জমে থাকে। একমাত্র পুনাখার উত্তাপ সামান্য কিছু অধিক হলেও, সন্ধ্যার পর রাস্তায় হাঁটা খুব একটা সুখের ছিল না। অন্ধকারে তরুণের মোবাইলের আলোয় দাঁড়িয়ে, কী করা উচিত ভাবছি। এখনও ক্যাফেটেরিয়ার কাছে এসে পৌঁছতে পারিনি, অর্থাৎ এখনও নিচে গাড়ির কাছে পৌঁছতে অর্ধেকের বেশি পথ বাকি। এমন সময় নিচ থেকে পুপুর চিৎকার শুনলাম। জিজ্ঞাসা

আছে, সেখানে ঘোড়ার মল পথ চিনতে সাহায্য করে। ক্যাফেটেরিয়ার আগে সে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, আর তার পরেও এই অন্ধকারে সেই দুর্মূল্য বস্তুটির দেখা পাওয়ার আশা কম।

শেষপর্যন্ত আবার সেই ওপরের বড় পাথরটার কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোতে যাব, এমন সময় ঠিক পিছনে, অর্থাৎ যে পথ ধরে এখানে এসে হাজির হয়েছি, একজনকে মোবাইল জ্বালতে দেখা গেল। ভদ্রলোক ঠিক পিছনে বাঁকের মুখে থাকায়, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি, তবে ওই পথ দিয়ে আমরাও এসেছি, কাজেই উনি এইমাত্র এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন বোঝা গেল। পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমার স্ত্রী 'ভাইসাব' বলে ডাকায় তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমাদের বিপদের কথা বলাতে জানালেন, যে ঠিক রাস্তাতেই এসেছি, তবে ভুল করে বাইপাস দিয়ে আসায়, চিনতে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি আমাদের এগিয়ে যেতে বলে জানালেন, যে বাজার আনতে নিচে যাচ্ছেন, তাঁর জন্য নিচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। বাজার নিয়ে আবার ওপরে ফিরে যাবেন। এপথে তিনি প্রায় রোজই যাতায়াত করেন এবং নিচে নামতে পৌনে এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা সময় লাগে। আমার স্ত্রী একটু সাহায্য করতে বলায়, দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু তিনি সম্ভবত বাঘের গুহা থেকে আসছেন, কাজেই তাঁর চিতাবাঘের মতো গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারব কেন? যথারীতি আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়ায়, তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে আমার স্ত্রীকে বললেন, আপনি খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আমাকে স্ত্রীর হাত ছেড়ে দিতে বলে তাঁকে বললেন, যে ঠিক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে দুহাতে কাঁধের দুদিকে শক্ত করে ধরতে। এবার স্বাভাবিকভাবে গতি অনেক কমে গেলেও, ইঞ্জিন যেমন করে রেলের কামরা টেনে নিয়ে যায়, সেইভাবে আমার স্ত্রীকে নিয়ে এগোতে শুরু করলেন।

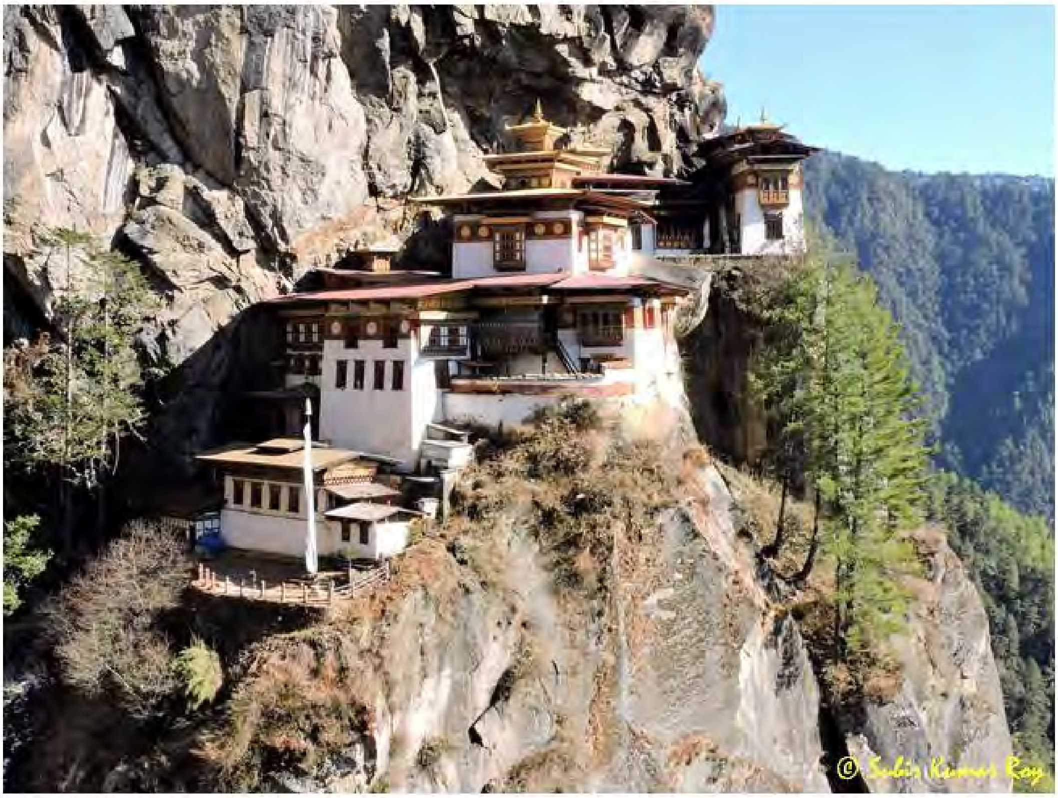

এতক্ষণ নিজে ব্যস্ত থাকায়, তরুণকে কোনরকম সাহায্য করার সুযোগ ছিল না। ঠিকভাবে এবং ঠিক জায়গায় পা না ফেলার জন্য, একটু আগেই সীমা একবার লালচে ঢালু জমির ওপর গড়িয়ে পড়ে গেছে। আমি আর তরুণ চেষ্টা করেও তাকে সোজা করে দাঁড় করাতে পারছিলাম না। শেষে অনেক চেষ্টায় পিছন থেকে বগলের তলা দিয়ে ওর হাত চেপে ধরে দাঁড় করাতে হয়েছে। তরুণকে সীমার হাত ছেড়ে দিতে বলে, আমি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরলাম। আমি নিজে দীর্ঘদিনের স্পন্ডাইলোসিসের রোগী, ডান হাতে এমনিই একটা যন্ত্রণার ব্যাপার আছে, তার ওপর এতক্ষণ ডান হাতের ওপর অত চাপ পড়ায়, যন্ত্রণাটা বেশ বেড়েছে। ভদ্রলোক মোবাইলের আলোয় পথ দেখিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, মাঝেমাঝে শুধু পা সোজা ও শক্ত রাখতে বলছেন। ওদের গতি আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে, হাঁটার ভঙ্গিমাও বেশ সাবলীল বলে মনে হলো। সীমাকে শক্ত করে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। ওই ভদ্রলোকের কায়দায় তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও, সেই শক্তি বা দম আমার কোথায়?

একসময় ক্যাফেটেরিয়ার কাছে চলে এলাম। এখানেই পুপু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, এবার সেও সঙ্গী হল। ওই ভদ্রলোকের মোবাইলে নিচ থেকে বারবার ফোন এলেও তিনি কিন্তু বিরক্ত হননি, বা ছেড়ে চলে যাননি, বরং নিজে থেকে বললেন যে "ভয় পেয় না, দরকার পড়লে আমি পিঠে করে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাব"। পুপুর কাছে জানা গেল, যে অনেক্ষণ আগে সোনম একবার ফোন করে জানতে চেয়েছিল, যে আমরা এখন কোথায়। পুপু জানিয়েছিল, যে সে নিজে

আরও অনেকটা পথ এইভাবে নেমে আসার পর সোনম আবার ফোন করলে আমরা তাকে একবার ওপরে আসতে বললাম। সত্যি কী না জানি না, তবে সোনম জানাল যে সে নাকি দুবার অনেক ওপর পর্যন্ত উঠে এসেও, আমাদের সাক্ষাৎ পায়নি। ওই ভদ্রলোক বললেন, তিনি অধিকাংশ সময় বাইপাস ব্যবহার করায় সোনম আমাদের খুঁজে পায়নি। ওঁর হাতে মোবাইলটা দিয়ে সোনমের সঙ্গে একটু কথা বলে ঠিক কোথায় আছি তাকে একটু জানাতে বললাম। উনি নিজেদের ভাষায় কথা বলে সোনমকে আমাদের অবস্থানটা জানিয়ে দিলেন। আবার এগিয়ে চললাম। জঙ্গলের পথ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হলেও উত্তেজনা ও শারীরিক পরিশ্রমে শীত সেরকম অনুভূত হচ্ছিল না।

এইভাবে আরও কিছুটা পথ চলার পরে টর্চ হাতে সোনম এসে হাজির হল। এত দ্রুত কিভাবে চলে এল বুঝলাম না। তাহলে কি ও আমাদের সাহায্য করতে এসে কাছেপিঠেই কোথাও ছিল, নাকি আমরা নিচে রাখা গাড়ির কাছাকাছি কোথাও এসে গেছি? মনে মনে প্রার্থনা করলাম, দ্বিতীয়টাই যেন সত্য হয়।

সোনম এসেই সীমাকে অনেকটা ওই ভদ্রলোকের কায়দায় ধরে, নিচে নামতে শুরু করল। বারবার সে সীমাকে পা সোজা করে হাঁটতে বলছে। সেই একেবারে ওপর থেকে এতটা পথ নিজের হাতের ওপর ওদের চাপ সহ্য করে এসে, আমি নিজেও বেশ ক্লান্ত। তবে মাইলের পর মাইল উতরাইয়ের পথ হাঁটতে, আমার কোনদিনই তেমন বিশেষ কষ্ট হয় না। ভারমুক্ত হয়ে হাঁটায় স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলাম। এতক্ষণ পর্যন্ত আলোর প্রয়োজনে আমি নিজের মোবাইল ব্যবহার করিনি। না,এখন দিবসও নয়, বা মনের হরষেও আলো জ্বালার প্রয়োজন অবশ্যই নয়, আলো না জ্বালায় স্বল্পালোকে হাঁটতে কিছু অসুবিধাও হচ্ছিল সেকথা সত্য। কিন্তু চাইছিলাম না, যে সবক'টা মোবাইলের ব্যাটারি একসাথে শেষ হয়ে যাক, কারণ এখনও কতটা পথ, বিশেষ করে কতটা সময় আলো জ্বেলে হাঁটতে হবে কে জানে?

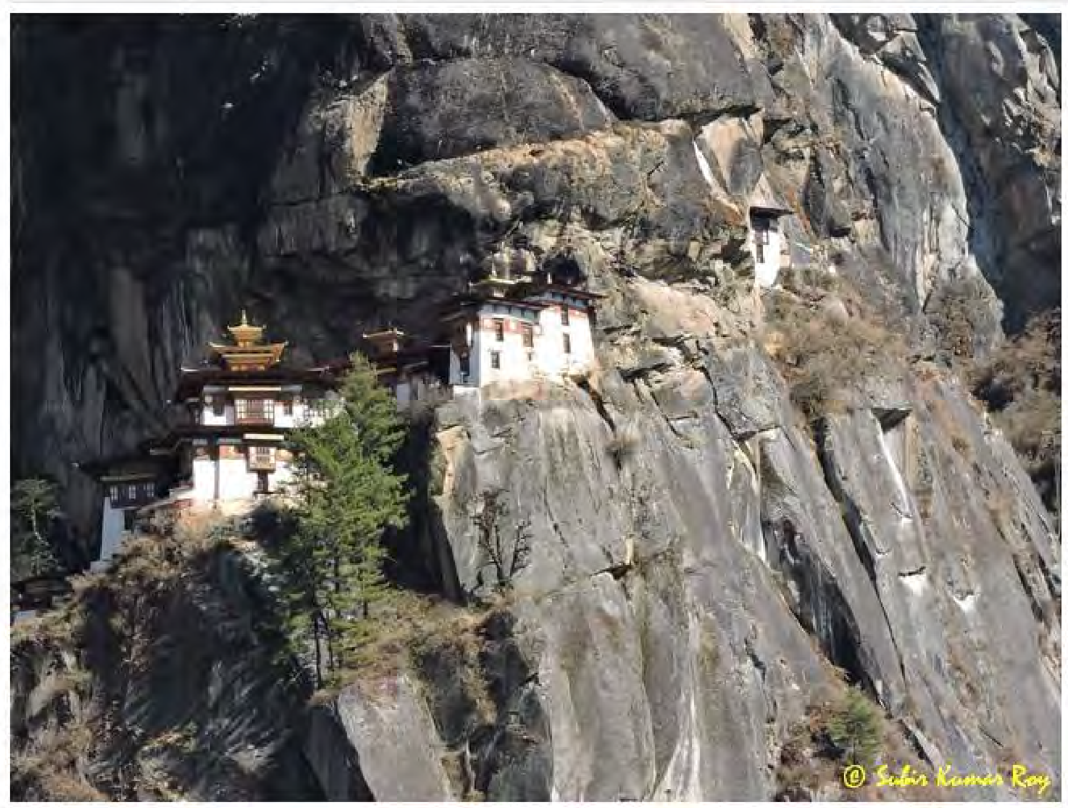

আসার পথে বারবার লক্ষ্য করেছি, যে সোনমের কথা বুঝতে না পারলে, অথবা ওর ইচ্ছা বা বক্তব্যকে উপেক্ষা করলে, ও ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। এখনো ও বারবার মোবাইল জ্বালাতে বলছে। 'পড়েছি সোনমের হাতে, মোবাইল জ্বেলে চলো সাথে' পন্থাই অবলম্বন করা শ্রেয় বিবেচনা করে, মোবাইলের টর্চ জ্বেলে ওদের সঙ্গে চললাম। আরও বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে এঁকেবেঁকে হাঁটতে হাঁটতে, একসময় মনে হলো নিচে নেমে এসেছি। কিন্তু গাড়ি রাখার বড় ফাঁকা অঞ্চলটা তখনও চোখে না পড়ায় বুঝলাম, আমরা শেষপ্রান্তে এসে পড়লেও এখনও কাঙ্খিত জায়গায় এসে পৌঁছইনি।

এইভাবে নেমে এসে একসময় আধো-অন্ধকারে সেই ফাঁকা নির্জন জায়গাটার একপাশে আমাদের সাদা গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আর কোন গাড়িতো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্যন্ত কোথাও নেই। ধীরে ধীরে সেই ঘেরা জায়গাটার ভিতর দিয়ে, যার সামনে থেকে যাওয়ার সময় লাঠি ভাড়া করেছিলাম, যার ভিতর দিয়ে ওপরে ওঠার পথে যাওয়ার সময়, মেলার মতো বিভিন্ন পসরা নিয়ে মেয়েদের বিক্রি করতে দেখেছিলাম, হেঁটে গিয়ে গাড়ির সামনে হাজির হলাম। কেউ কোথাও নেই যে লাঠিগুলো ফেরৎ দেব। সোনম আমাদের পাঁচটা লাঠি একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এবার ভদ্রলোকের কাছে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা চাইলে, জানালেন তাঁর কোন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নেই। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করাতে,

তাঁকে এইভাবে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে শুধু বললেন, "ধন্যবাদ কিস্ লিয়ে, এ তো হামারা ফর্জ থা।" আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। আমার হৃদয়ে তিনি মানব প্রেমের প্রতীক হয়েই চিরদিন অবস্থান করুন।

সঙ্গে এখন কোনও লাগেজ নেই, তাই গাড়ির ছটা সিটই ফাঁকা। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় সোনমের কিছু কথা হল। বুঝলাম তাঁর গন্তব্যস্থলে সোনম পৌঁছে দিয়ে যাবে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। যাওয়ার পথে একসময় একটা বড় হোটেলের মতো বাড়ির সামনে তিনি নেমে গেলেন। জানি না তাঁর কথামতো আজই আবার ওপরে ফিরে যাবেন কি না। একটা ছবি নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর মতো প্রচারবিমুখ একজন মানুষকে, যিনি নিজের নাম পর্যন্ত বলতে চান না, ওই রাতে ওই অবস্থায় ছবি তোলার কথা বলাটা কিরকম হাস্যকর মনে হল।

রাত প্রায় পৌনে নটার সময় হোটেলের সামনে নামলাম আমরা। সোনমকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রলোক তার পরিচিত কি না। সোনম জানাল, উনি তাক্তসাং গুহার একজন লামা। সোনম গাড়ি নিয়ে চলে গেল। হোটেলে কোনও খাবার না পাওয়ায়, আমি আর তরুণ একটু দূরের 'হোটেল ড্রাগন'-এ গেলাম রাতের খাবার কিনে আনতে।

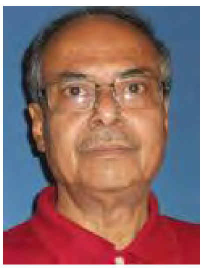

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায় প্রধানত ভ্রমণ কাহিনী লিখতে ভালবাসলেও তাঁর ঝুলিতে ছোট গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা, ইত্যাদির সম্ভারও যথেষ্ট। ১৯৭৯ সালে জীবনের প্রথম ট্রেকিং থেকে ফিরে লেখালেখির শুরু এবং তারপর থেকে সেই অভ্যাস আজও রয়ে গেছে। বিভিন্ন ই-ম্যাগাজিন ছাড়া, তাঁর লেখা বহু পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে।

Comments

Name

Enter your comment here

Comment | Add Image

Not using Html Comment Box yet?

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

একদিনের জনাই ভ্রমণ

সৌমাভ ঘোষ

করোনা নামক একটি আণুবীক্ষণিক জীবের কল্যাণে মানব সভ্যতার বিজয় রথের গতি কিছুটা হলেও শ্লথ হয়ে পড়েছিল। ঘরবন্দি হয়ে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' এবং 'ওয়ার্ক ফর হোম'-এর জাঁতাকলে জীবনটা কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে যেতে লাগল। ভ্রমণপিপাসু বাঙালির বিচরণক্ষেত্র ব্যাঙ্ক আর বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। এইভাবে একটা একটা করে দিন কাটছিল ঠিকই কিন্তু জীবনের একঘেয়েমি কাটছিল না বরং আরও বেশি তিক্ততায় ভরে উঠছিল। এই তিক্ততা কাটানোর জন্য দরকার ছিল একটু মিষ্টির। তাই করোনার প্রথম ঢেউ একটু থিতিয়ে পড়তেই মিষ্টত্বের খোঁজে আমরা পাড়ি দিলাম জনাই। কারণ একটাই জনাই-এর মনোহরণকারী মনোহরা।

সকালের হাওড়া-বর্ধমানগামী কর্ড লাইনের ট্রেনে মাস্ক পরে আর স্যানিটাইজার সঙ্গে নিয়ে সকলে বেলুড় থেকে চেপে বসলাম এবং যথাসময়ে নামলাম জনাইরোড স্টেশনে। এতদিন ঘরবন্দি থাকার পর বেরোনো হয়েছে তাই কেউই শুধুমাত্র মিষ্টি খেয়েই বাড়ি ফিরতে রাজি নয়! আপাতত স্টেশনের কাছেই একটা দোকানে গরম গরম হিংয়ের কচুড়ি, ছোলার ডাল, জিলিপি এবং ধূমায়িত চা সহযোগে জলযোগ সারা হল এবং তার সঙ্গে দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে রওনা দিলাম জনাই বাজার। সেখানেই রয়েছে সারি সারি জনাই-এর প্রধান আকর্ষণ মনোহরার দোকান। দেখে সত্যিই বলতে ইচ্ছে করে 'এ কোথায় এলাম!' যেদিকেই তাকাই প্রত্যেক দোকানে সুসজ্জিত রয়েছে মনোহরণ, গোলাকার গড়ন মনোহরা। তাদের অমোঘ হাতছানি উপেক্ষা করে আমরা পাড়ি জমালুম দর্শনীয় স্থানের উদ্দেশ্যে।

রাস্তায় প্রথমেই পড়ল কালীবাবুর বাড়ি মতান্তরে জনাই জমিদারবাড়ি। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কারণে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান না থাকায় বর্তমানে বাড়িটির অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। সামনের দিকটা মোটের ওপর ভাল থাকলেও ভিতরে ঢোকার অনুমতি নেই। চৌহদ্দির মধ্যেই রয়েছে দুটি শিবমন্দির। তার পাশেই দেখলাম চলছে ঠাকুর তৈরির কাজ। কোথাও কাঠামো নির্মাণ, কোথাওবা খড়ের ওপর মাটি লেপার কাজ। একজন পটুয়া নিপুণ হস্তে মৃন্ময়ী দেবীর চোখ আঁকছেন। আমরা গিয়েছিলাম জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি, চোখে পড়ল রোদের মধ্যে পর পর দাঁড়িয়ে রয়েছে বাগদেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি রঙের অপেক্ষায়। জানা গেল করোনার প্রকোপ থাকায় ঠাকুর একটু কমই বায়না হয়েছে।

সেখান থেকে পাড়ি জমালুম বারো শিবমন্দির। পথে পড়ল জোড়া শিবমন্দির। পাশাপাশি ছয়টি করে শিব মন্দির দুই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণের পাশে শ্মশান। প্রাঙ্গণটি ছাড়িয়ে আর একটু এগোলে চোখে পড়ল মিত্র বাড়ির ভিটে। দেখলেই বোঝা যায় এককালে বেশ বর্ধিষ্ণু ছিল বাড়িটি,বর্তমানে পিকনিক স্পট হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। মিত্র

এরপর চৌধুরীদের নাটমন্দির ও দুর্গা দালান যাওয়ার পথে পড়ল বদ্যিমাতার মন্দির। প্রাঙ্গণে অবস্থিত হাঁড়িকাঠ এখনও মন্দিরে বলি হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে। এরপর চৌধুরীদের নাটমন্দির ও দুর্গা দালান। বাড়িটির গড়নও চৌধুরীদের স্বচ্ছল অবস্থারই পরিচায়ক। নাটমন্দির ও দুর্গা দালান ডানপাশে রেখে এগিয়ে গেলে চোখে পড়ে চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত রাধা মাধবের মন্দির। দুর্গা দালানে পুজো হয় আর নাটমন্দিরে হয় রাস উৎসব। করোনাকালের জন্য মাটিতে আঁকা গণ্ডী প্রচুর লোকসমাগমের সাক্ষ্য বহন করছিল।

এসব দেখতে দেখতেই দুপুর হতে চলল। এইবার ফেরার পালা। পথে পড়ল একটি অপূর্ব সুন্দর নার্সারি। শীতকাল একদিকে যেমন ভ্রমণের সময়, তেমনই প্রকৃতিও সেজে ওঠে বিভিন্ন রঙে। তারই স্পর্শ লেগেছে এই নার্সারিতে। ডালিয়া, গোলাপ,পিটুনিয়া, গাঁদা চারিদিক ভরে রয়েছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। নার্সারি দেখে পৌঁছলাম জনাই বাজারে।

সবশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ হল মনোহরা দিয়ে। মিষ্টি কিনলাম ছোটু ময়রার দোকান থেকে। আলাপ হল ছোটু বাবুর ছেলের সঙ্গে। তিনিই বর্তমান মালিক। দেখলাম সাদা ধবধবে কাঁচাগোল্লার ওপর ঘন চিনির রস ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ খোলা হাওয়ায় রাখলেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে মনোহরণকারী মনোহরা। তবে ক্রেতার চাপ খুব থাকলে কৃত্রিম উপায়ে পাখা চালিয়েও

চাপেই চিনির দুর্গের পতন হল। ভেতর থেকে অমনি বেড়িয়ে এল ছোট এলাচ ও পেস্তা সহযোগে মিহি ক'রে গড়া ছানার কাঁচাগোল্লা। যেমন তার স্বাদ তেমনই তার সুবাস।

মনোহরা ছাড়াও আলাপ হল নিখুঁতি আর রাম বোঁদের সঙ্গে। এঁরা দুজনও নিজেদেরকে শক্ত চিনির আস্তরণের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করেন। প্রথমে আসি নিখুঁতির কথায়। আকার ভেদে ৫ এবং ১০ টাকার দুরকম নিখুঁতি পাওয়া যায়। ওপরের চিনির আস্তরণে অসাবধানে কামড় বসালে ভিতরের টলটলে রস গায়ে চলকে এসে পড়ে জামা ভিজিয়ে দিতে পারে। সেকারণে এঁকে জিভের ওপর রেখে কামড় দেওয়াই ভাল। তবে একটা কথা মানতেই হবে কামড় দেওয়ার পরের অনুভূতিটা সত্যিই স্বর্গীয়! এরপর বলি রাম বোঁদের কথা। এটি বিক্রি হয় ওজনে। এর ওপরও থাকে চিনির রসের শক্ত আস্তরণ।

এবার প্রশ্ন হল কেন এই চিনির আস্তরণ? জামাই ঠকানো নাকি মিষ্টি ভাল রাখা - যে কারণেই হয়ে থাকুক না কেন অসাধারণ প্রণালী। শুধুমাত্র মিষ্টিকে ভাল রাখে তাই নয়, স্বাদও বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। মিষ্টি খেয়ে এবং বাড়ির জন্য কিনে টোটোয় চড়ে বসলাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

স্টেশনের কাছে মধ্যাহ্নভোজন সেরে হাওড়াগামী ট্রেনে চাপলাম। রথ দেখাও হল, কলা বেচাও হল। মাস্কে মুখের অর্ধেক ঢাকা থাকলেও সকলের মুখ-চোখের অভিব্যক্তি সাক্ষ্য বহন করছিল যে করোনাকালের এই ভ্রমণ যেন এক ঝলক মুক্ত বাতাসের স্পর্শ এনে দিয়েছে সকলের মনে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. টেক সৌমাভ ঘোষ বর্তমানে রেডিওফিজিক্স-এ পি.এইচ.ডি.রত। দেশবিদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে কাজের ফাঁকে অবসর কাটে বই পড়ে, ছবি এঁকে আর লেখালেখি করে। সবরকম বই পছন্দ হলেও ঐতিহাসিক ভ্রমণ ও থ্রিলারের আকৃষ্ট করে খুব। এছাড়াও ভালবাসেন বেড়াতে - সমুদ্র এবং ঐতিহাসিক স্থান বেশি পছন্দের। ভ্রমণের সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকে ভোজন - "ফুড ওয়াক"।

বড়ন্তির সূর্যাস্ত

অরিন্দম পাত্র

শুধু একটা সানসেট দেখতে এতদূর ছুটে আসতে হবে!! বাড়ির লোকজন চটে লাল আমার প্রস্তাব শুনে! বাবা বাছা করে বোঝাতে শুরু করলাম...। উফফ, নেপালের নাগারকোটে কি দেখোনি দুর্দান্ত একটা সানসেট? বা কৌশানির অনাসক্তি আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে দেখা অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণে আলোকিত ত্রিশূল পর্বত? বড়ন্তিও কিছু কম যায় না। আরে, একবার গিয়ে দেখোই না! সঙ্গে এইসময় উপরি পাওনা থোকা থোকা পলাশ ফুল! এছাড়াও আছে আরও অনেক সাইট-সিইং-এর জায়গা। জয়চন্ডী পাহাড়, বেরো হিল, গড়পঞ্চকোট, মাইথন... চলোই না!
এত বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে শেষমেশ চলেই এলাম বড়ন্তি! হাওড়া থেকে পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে আসানসোল, তারপর গাড়িতে ঘন্টা দেড়েকের পথ পেরিয়ে বড়ন্তি গ্রাম। ঠাঁই হল বড়ন্তি নেচার ইকো রিসর্টে। সুন্দর খেলার জায়গা -বাচ্চাদের জন্য সঙ্গে খাঁচায় বন্দী অনেক পাখি আর খরগোস। ছেলের খুব পছন্দ হল দুই এমু পাখিকে।
পৌঁছেই সবাই খিদেতেষ্টায় কাতর হয়ে পড়লাম। রিসর্টের ডাইনিং হলে দ্বিপ্রাহরিক আহারপর্ব সেরে অল্প বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছে হল বাকিদের। কিন্তু আমার মন টানছে বাইরে। বেরিয়ে ডানদিকে অল্প পা চালিয়ে এগোলেই বড়ন্তি লেক। চারিদিকে পলাশের ছড়াছড়ি। ক্যামেরা হাতে করে বেরিয়ে পড়তেই হল। কাঁহাতক অলস ভাবে বসে থাকা যায়!

পলাশের সমাহার। লালে লাল চারিদিক। আগুনরঙা সেই পরিবেশ সত্যিই মন ভাল করে দেয়। আশ মিটিয়ে পলাশের ছবি তুললাম।

আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে এল। প্রায় বিকেল পাঁচটা বাজে। বাকিরা এতক্ষণে গা ঝাড়া দিয়ে আলসেমি কাটিয়ে বেরিয়ে এল। "সূর্য ডোবার পালা, আসে যদি আসুক বেশ তো!" সানসেট দেখতে হবে যে -বড়ন্তির বিখ্যাত সূর্যাস্ত!
বেশ অনেক জায়গায় সানসেট দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। সে ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। কিন্তু পুরুলিয়ার বড়ন্তি লেকে যে সূর্যাস্ত দেখলাম তা অনেকদিন মনে থাকবে।

ধীরে ধীরে দিনমণি অদৃশ্য হয়ে গেলেন লেকের জলে। আকাশে কিন্তু তার রেশ রয়ে গেল বহুক্ষণ! সেই রাঙা আলোয় আধো-অন্ধকারে লেকের জলে ব্যস্ত কয়েক জন ধীবর ভাই। ছোট ছোট ডিঙি নৌকো চেপে মাছশিকারে মগ্ন তাঁরা তখনো। তারপর আকাশে চাঁদ উঠল আধখানা। চারিদিকের পরিবেশ আরও মোহময় হয়ে উঠেছে। আকাশের রঙের খেলা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। এবারে ঝুপ করে আঁধার নেমে আসার পালা।

আমরা একদল মানুষ তখন এই অপরূপ প্রাকৃতিক পট দর্শন করে মুগ্ধ, বিস্মিত, হতবাক! নাঃ, সত্যিই বড়ন্তির সূর্যাস্ত অনন্যতায় এক আলাদা স্থান পাবেই!

মার্চে পলাশ রাঙা বড়ন্তি তো দেখা হল। ইচ্ছে রইল একবার বর্ষার ঠিক পরে পরেই আসার! আকাশজোড়া মেঘের খেলা আর নানান রঙের ছটায় দীপ্ত সূর্যাস্ত্ দেখার জন্য।

পেশায় চিকিৎসক (নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ) অরিন্দম পাত্রের নেশা ছবি তোলা। এছাড়াও দেশের মধ্যে নানা জায়গায় ভ্রমণ করা তাঁর আর এক শখ। ইদানীং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিয়মিতভাবে 'আমাদের ছুটি'-র পাতায় লেখালেখি।